১ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল। [১ম সংখ্যা।

(নবপর্য্যায়)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

সম্পাদিত।

বীরভূম-সাহিত্য-পরিষৎ।

বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ।

১৩১৭।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

সহ সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতমপুর, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরকারী উকীল, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, সিউড়ি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র বি, এল।

সহ সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত সন্তোশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ।

ধন রক্ষক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও উকিল সিউড়ি।

গ্রন্থ রক্ষক—শ্রীযুক্ত শিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল।

আয় ব্যয় পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভৌমিক এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল বি, এল।

পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, অধ্যাপক ও উকীল।

ছাত্র সভ্য-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি,এ, পুথি সংগ্রাহক ও মাসিক পত্রের এজেন্ট—শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম, এ, বি, এল, রামপুরহাট, শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, ভূতপূর্ব্ব "বীরভূমি" সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, বোলপুর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল দুবরাজপুর, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চৌধুরী বি, এল, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত চারুশশী চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী "বার্ত্তা" সম্পাদক রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘোষ; খান বাহাদুর মৌলভী সামসুজ্জোহা বি, এ, জমিদার, সেকেড্ডা।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

২। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে।

৩। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৪। যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা, এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় গণপুর, ভায়া মল্লারপুর, বীরভূম, এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলে সমস্ত অবগত হইবেন।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ,

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ সিউড়ি, বীরভূম।

সূচীপত্র।

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; অগ্রহায়ণ, ১৩১৭]

(নবপর্য্যায়)

১ম বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল। ১ম সংখ্যা।

স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প।

মনুষ্য-প্রকৃতির উৎসমূলে যে পরম-তত্ত্ব অব্যক্তভাবে নিত্যকাল বিদ্যমান, যে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিবার জন্য, পরিস্ফুট ভাবে অনুভব করিবার জন্য, ব্যষ্টি ভাবে মানব ও সমষ্টিভাবে সমাজ, সাধনা ও সভ্যতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, আমরা সেই বিশ্বজনীন মহাদর্শস্বরূপ কল্যাণ-মূর্ত্তি পরমতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের এই শুভ সঙ্কল্প তাঁহারই প্রেরণা হউক, আমাদের সমগ্র চেষ্টা তাঁহারই অভিমুখী হউক, আমাদের কর্ম্মপুঞ্জ যেন তাঁহাতেই অবসান ও শাশ্বত সার্থকতা লাভ করে।

আজ আমরা যে কার্য্যের ভার মস্তকে বহন করিয়া সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলাম, সেই শুভকার্য্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক সাধনশীল ব্যক্তির চেষ্টার আশ্রয়ে আরব্ধ হইয়াছিল। ১৩০৬ সাল হইতে ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত বীরভূম জেলার অন্তর্গত কীর্ণাহার নামক গ্রাম হইতে স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত নৌরেশচন্দ্র সরকার মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে ও অকৃত্রিম সাহিত্য সেবক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহোদয়ের সম্পাদকতায় "বীরভূমি" নামক মাসিকপত্র নিয়মিত ভাবে বাহির হইয়াছিল।

নানাকারণে "বীরভূমি"র সেই প্রকাশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এখন অতীতের প্রতি চাহিয়া সেই চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে "বীরভূমি" বীরভূমের প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে যে সাধু সঙ্কল্পের বীজ, যে সাধনার প্রাণশক্তি বপন করিয়াছিল, তাহা আদৌ নষ্ট হয় নাই।

এই নবজীবনের উদ্বোধনের শুভ মুহূর্ত্তে, এই সর্ব্বতোমুখী জাগরণের আলোকে বীরভূমকে যে চেতন ভাবে বিশ্বমানবের বিস্তৃততর জীবন-প্রবাহের মধ্যে সজীব ও সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে, সাহিত্যিক আদানপ্রদানের মধ্যে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর ভাবে আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে হইবে; —এই নবজীবনের প্রাণময় উৎসব ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলিবার আছে এবং ইহার সমগ্রতাটুকুই আমাদের গ্রহণীয়, আর এই আদান প্রদানই আমাদের জীবনের একমাত্র সার্থকতা, এই ভাবের স্পন্দন "বীরভূমি"— প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া অনেক নীরব হৃদয়ের মধ্যেই যে একটা স্থায়ী আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আমরা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

আমরা যখন মনে করিলাম যে 'বীরভূমি' নির্ব্বাণ লাভ করিল, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে "বীরভূমি"র সনাতন আত্মা কেন্দ্র হইতে প্রসারিত হইয়া পরিধির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল মাত্র। এই কয়েক বৎসরের নীরবতা মৃত্যুর জড়তা নহে—একটা পূর্ণতর জীবনের উদ্যোগ-পর্ব্বমাত্র।

আজ আবার 'বীরভূমি' আশাপূর্ণ হৃদয়ে লোকসমাজে আবির্ভূত হইল; পূর্ব্বে যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় "বীরভূমি"র সর্ব্বস্ব ছিল, আজ "বীরভূমি" তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হইলেও একমাত্র তাঁহারাই আজ 'বীরভূমি'র সর্ব্বস্ব নহেন। আজ আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রবর্ত্তক ও পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহাদের নমস্কার করিতেছি; আশা করি "বীরভূমি" তাঁহাদের পূর্ব্বস্নেহে বঞ্চিত হইবে না। তাঁহাদেরই "বীরভূমি" বীরভূমের সমস্ত শিক্ষিত লোকের মনে যে আদর্শ ও সাধনার প্রতিধ্বনি জাগ্রত করিয়াছিল, সেই প্রতিধ্বনি সমূহ, সেই সমস্ত ব্যক্তির শক্তিতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া, আজ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; বীরভূমের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীভূত এই সাহিত্যিক সাধনশক্তিই আজ 'বীরভূমি'র পালক ও রক্ষক।

যাঁহারা "বীরভূমি"র প্রবর্ত্তক, স্নেহ ও যত্নের সহিত দীর্ঘকাল যাঁহারা ইহাকে পালন করিয়াছেন, তাঁহারা আজ বীরভূমবাসী ভদ্র সাধারণের

"বীরভূমি"র প্রতি এই আদর ও আগ্রহ দর্শনে নিশ্চয়ই আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইবেন।

নব্যবঙ্গের জাতীয় সাধনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সময়ে এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সব নূতনতর প্রয়োজন আমাদের পুরোবর্ত্তী হইয়াছে, যে এখন রাজধানীর বাহিরে মফঃস্বলে স্বাধীন সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখন একক বহু হইতে হইবে—ভবিষ্যতে বহুর মধ্য দিয়া এক, আপনার সত্বা পূর্ণতররূপে বুঝিতে পারিবেন।

চেতনজীবের সমষ্টির বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি অংশী বা সমষ্টির ধর্ম্ম চেতনভাবে উপলব্ধি করিয়া স্বাধীন-ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অনুবর্ত্তন করে। বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা ইহাই উন্নততর সাম্য। ইহাই সত্বগুণাত্মক। আমাদের দেশকে এই সাম্যে লইয়া যাইতে হইলে প্রত্যেক জেলাকে এখন স্বাধীন ভাবে আত্ম-উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই প্রকারের একটা ভাবের স্পন্দন বীরভূমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই স্পন্দনের শক্তি ও সারবত্তা বাস্তবে আনিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও সত্যের প্রেরণা হয়, তাহা হইলে এই স্পন্দনের দেহস্বরূপ এই "বীরভূমি" স্থায়িত্ব লাভ করিবে ও ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আর যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে বিধাতার অনির্দ্দেশ্য ইচ্ছায় 'বীরভূমি' দীর্ঘজীবি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই। অবশ্য এই চেষ্টা বিফল হইবার নহে; ভবিষ্যত এই চেষ্টার ধ্বংশাবশেষের উপর আপনার গৌরবময় বিজয়-পতাকা উচ্চ করিয়া প্রোথিত করিবার সুবিধা লাভ করিবে। সুতরাং বিলোপেও ইহার একটা সার্থকতা থাকিয়া যাইবে।

এখনও আমাদের সাহিত্যের যে অবস্থা তাহাতে ব্যবসায়ের উপকরণ স্বরূপে সাহিত্যকে এখনও ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের মত মনের পুষ্টির জন্য যে দিন সাহিত্যের প্রয়োজন হইবে সে দিন এখনও অনেক দূরবর্ত্তী। তখন সাহিত্যকে আমরা যদ্যপি পণ্য বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত মাতৃভাষার যে সম্বন্ধ

তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যকে লইয়া এখন ও দীর্ঘকাল যাচক ভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। যাঁহারা মহা নগরীর বিপুল কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বাস করেন তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা মফঃস্বল হইতে এই প্রয়োজন টুকু তীব্রতর ভাবে অনুভব করি—এ কথা বলিলে অবশ্য দাম্ভিকতা প্রকাশ করা হইবে না।

এখন দেশে অনেক উচ্চশ্রেণীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্র রহিয়াছে, সেই সমস্তের সহিত প্রতিযোগীতা-ক্ষেত্রে আমরা কোথায় দাঁড়াইব তাহা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। একটা কথা বেশ জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কোনও সাহিত্যপ্রচারের প্রতি এক সম্প্রদায় পাঠক ও লেখকের যত দিন আত্মীয়তার বোধ জাগরিত না হয়, তত দিন সেই সাহিত্যপ্রচার স্বকীয় অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না। কলিকাতা হইতে প্রচারিত মাসিক সাহিত্য অপেক্ষা এই বীরভূমির প্রতি বীরভূম বাসী সাধারণের এই 'অভিনিবেশ' উদ্রিক্ত হওয়া যে অতি সহজ ও স্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মফঃস্বল হইতে মাসিক পত্র প্রচারের ইহাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। বীরভূমিকে আশ্রয় করিয়া বা প্রতীক স্বরূপে গ্রহণ করিয়া বীরভূমবাসী শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি বঙ্গভাষার উপর স্নেহ ও অনুরাগের সহিত নিবদ্ধ হইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

যাহা হউক "বীরভূমি"-প্রচারের সহিত অর্থার্জ্জন-স্পৃহার বা যশোলিপ্সার কোনই সম্বন্ধ নাই; ইহা একটি কর্ত্তব্যের প্রেরণা মাত্র। বীরভূমে সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা যতদূর সম্ভব তাহা সাধন করা ও সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্ন লোকহিতকর সদনুষ্ঠানের যতখানি ভিত্তিস্থাপন ও বলাধান করা সম্ভব, তাহাতে "বীরভূমি" আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের যাহা দেয়, তাহাও আমরা এই বীরভূমি'র মধ্য দিয়া সংহত ভাবে বঙ্গবাণীর অর্ঘ্যডালায় অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

নূতন নূতন আলোক রাজ্যের মধ্য দিয়া মানবীয় সাধনা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে; আমাদের জীবনের পুষ্টির জন্য আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতার জন্য সেই আলোক ও সেই উত্তাপ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাহিরের এই আলোকরশ্মি বীরভূমে আনিবার জন্য এই ক্ষুদ্র 'বীরভূমি' প্রতিষ্ঠিত হইল।

বীরভূমেও সাহিত্যক শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ আছে, আজ তাহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; সেই শক্তি এই 'বীরভূমি'তে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই 'বীরভূমি' বিশ্ব সাহিত্য ও সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সহিত বীরভূমবাসীর সম্মিলিত সাহিত্যিক সাধন-প্রবাহের মিলনক্ষেত্র হইয়া পুণ্য প্রয়াগে পরিণত হউক, তাহা হইলেই আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদ।

আমরা বীরভূমবাসী, চণ্ডীদাস আমাদেরই। সেই জন্য চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ উঠিলেই মনে নানা কথার উদয় হয়। মনে হয়, পৃথিবীর কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চআসনে চণ্ডীদাসকে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করি এবং তাঁহার যশোগান করিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করি। কিন্তু আজ সে জন্য এখানে আসি নাই। যদি ভগবান দিন দেন তবে ষোড়শোপচারে চণ্ডীদাসের পূজা করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জুড়াইব, বুঝিব ও বুঝাইব, যে, চণ্ডীদাসের জন্মভূমি মহাতীর্থ বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। *

পদসংগ্রহের ইতিহাস।

আজ প্রায় ১১ বৎসর হইল যেদিন কীর্ণহারের জমিদার মহানুভব সাহিত্যানুরাগী বদান্যবর শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে "বীরভূমি" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, সেই দিন হইতে চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদগুলির আবিষ্কার বাসনা আমার মনে জাগিয়া উঠে। কীর্ণহার অঞ্চলের লোকের গৃহে গৃহে যে সকল জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথি আছে, আমি সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, কীর্ত্তনগায়কও অপর লোকের মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যখন যে পদটি শুনিতে পাইয়াছি সাদরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে অনেকগুলিপদ

---

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ লেখা হওয়ার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিলাম যে মৎসংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদাবলী মূল পরিষদ হইতে ছাপা হইবে। প্রেসে কাপি দেওয়া হইয়াছে ভাল কাগজ ভাল অক্ষরে ছাপা হইবে। সম্ভবতঃ ছয় মাসের মধ্যে মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইবে

"সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা" ও "বীরভূমিতে" প্রকাশিত করিয়াছি। এইরূপে সাতবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি চণ্ডীদাসের প্রায় ৮৫০টি পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই গুলির মধ্যে প্রায় ৫০০শত পদ নূতন। সংগ্রহ কার্য্য এখনও চলিতেছে।

পদবিভাগ।

নবাবিষ্কৃত পদগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। ২। অভিসার। ৩। গোষ্ঠলীলা। ক। দান খ। নৌকাখণ্ড। গ। বনভোজন। ঘ। ধেনুবৎস শিশু হরণ। ৪। রাসলীলা। ৫। অক্রূরাগমন। ৬। যশোদা বিলাপ। ৭। গোপীবিলাপ। ৮। রাখাল বিলাপ ও বৃন্দাবনে শোকোচ্ছ্বাস। ৯। মথুরাগমন। ১০। গন্ধমাল্য পরিধান। ১১। কংসবধ। ১২। নন্দ বিদায়। ১৩। নন্দের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন ও ব্রজ বাসিগণের খেদ।

এখন এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে সকল পদ আমি সংগ্রহ করিয়াছি সে গুলি যে চণ্ডীদাসেরই, তাহার প্রমাণ কি? চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে চণ্ডীদাসের পদ হইল এমন বলা যায় না। এ কথার উত্তর যদি আমি না দিতে পারি তবে যখন আমি চণ্ডীদাসের পদের বাজরা লইয়া সাহিত্যের বাজারে প্রবেশ করিতে যাইব, তখন যে আপনারা আমাকে "অর্দ্ধচন্দ্রং দত্বা নিঃসারিত" করিবেন তাহা আমি বেশ জানি। আমার উত্তর এই,—এখন সাহিত্যের ব্যবসায় করিয়া অনেকেই অর্থার্জ্জনের সুগম পথ প্রাপ্ত হইতেছেন; টাকাটাই যখন দরকার তখন আসলের নামে ভেজাল মাল বাজারে চালাইবার প্রবৃত্তি এখন অনেকের পক্ষেই প্রতিরোধ করা কঠিন হইতে পারে— কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের দেশেত কেহ সাহিত্য লইয়া ব্যবসা করিত না। তবে কেন জুয়াচুরি করিবে? লাভের মধ্যে যশঃ। নিজের পদে অপরের ভণিতা দিলে যে যশোলাভটা উল্টা হইয়া গেল। এত নির্ব্বোধ যে প্রাচীন পদকর্ত্তারা ছিলেন তাহাত বোধ হয় না। আর এক দফা জবাব এই যে, যেমন কোন লোকের হাতের লেখা দেখিলে নাম না থাকিলেও চেনা যায় যথা, শিবরতন বাবু যদি পত্রে নাম দিতে ভুলিয়া যান অথবা অপর নাম দেন

হইলেও যেমন আমি বুঝিতে পারি যে পত্রখানি শিবরতন বাবুর লেখা, নি কোন কবি বা লেখকের রচনা যদি ভাল করিয়া পূর্ব্ব হইতে পড়া ক তবে তাঁহার রচিত পদ দেখিলেই চেনা যায়। প্রত্যেক লেখকেরই খবার, ভাব প্রকাশ করিবার একটা ধারা আছে। তাঁহার সকল রচনা-ই সেই ধারাটা অবশ্যই থাকিবে। চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদগুলিতে ই ধারা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। নূতন পুরাতন সকল পদগুলিই যেন সোণার তারে গাঁথা মণিমাণিক্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। আরও একদফা াব আছে। আমি একখান পুঁথি দেখিয়া কাজ করি নাই। অবশ্য ানতঃ একখান বড় পুঁথিই আমার অবলম্বন। কিন্তু সেই বড় পুঁথিতে সব নূতন পদ আছে, অন্যান্য ক্ষুদ্র পুঁথিতে কিছু কিছু সেই সব পদ খিয়াছি। রাসলীলা সম্বন্ধে আমি তিনখান পুঁথি পাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের র্ব্বরাগ সম্বন্ধে নূতন পদগুলি যদিও আমি অপর কোন পুঁথিতে দেখি নাই ট—কিন্তু ঐ সব পদ যে অপর পুঁথিতে আছে তাহার সন্ধান আমি ইয়াছি। বহু চেষ্টাতেও সেই দ্বিতীয় পুঁথি খানি হস্তগত করিতে পারি ই। "পদমেরু" নামক একখানি বৃহৎ সংগ্রহ পুঁথিতে গোপী বিলাপ সম্বন্ধে তকগুলি নূতন পদ দেখিলাম তাহা আমার পুঁথিতে আছে। এইরূপে দূর পারিয়াছি পদগুলি চণ্ডীদাসের কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি। াহাতেও যদি জুয়াচুরি ধরিতে না পারিয়া থাকি তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ষ এইটা ভাবিয়াছি, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি প্রকাশ হইয়া যাউক, াহার পর যদি আপনারা বলেন যে অমুক অমুক পদ চণ্ডীদাসের নয় তখন হয় দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি বাদ দেওয়া যাইবে। বাজারে ভাল মন্দ সব াল আনিয়া উপস্থিত করি আপনারা দেখুন, আসল লইবেন, মেকি বাদ বেন।

এইবার নবাবিষ্কৃত পদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

এক দিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন। কছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া তিনি সুবলকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে ারুণ বেদনা উপস্থিত। কাহার কাছে মনোবেদনা প্রকাশ করিবেন? বল তাঁহার প্রাণের সখা "মরম ব্যথিত"। তাই তাহাকেই বলিলেন।

এক দিন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গাভী ধবলী অপর ধেনুর সহিত বৃকভানুরাজার পাড়ায় চলিয়া গেল। গাভীর অনুসন্ধানে তিনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যে অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল—হৃদয় আলোড়িত হইল। দেখিলেন নীলবসন পরিহিতা, চন্দ্রোজ্জলবর্ণা এক রমণী স্বর্ণ কলসী কক্ষে বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। নীলবসন ভেদ করিয়া তাহার রূপের ছটা বাহির হইতেছে। বহুমূল্য নানাবিধ অলঙ্কারে তাহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অঙ্গের সৌরভে অলিকুল মত্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। এই রমণীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয় কেমন করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। নিদ্রা নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই রমণীকে পুনরায় না দেখিলে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে না। সুবল সকল শুনিলেন, সকল বুঝিলেন। মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না—আমি সত্বরেই তাহার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিব। আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানি, তাহার প্রভাবে তাহাকে লইয়া আসিব।" শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে তাহার ইন্দ্রজাল বিদ্যার কিছু পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সুবল মৎস্যকূর্ম্ম প্রভৃতি দশাবতারের রূপ দেখাইয়া শ্রীরাধিকার মোহিনী মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে ধরিলেন। সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে পূর্ব্বে তিনি যে রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এ সেই রমণী। শ্রীকৃষ্ণকে যমুনাতীরবর্ত্তী চম্পক বনে রাখিয়া সুবল মধুমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচ জন সখা বৃকভানু রাজার প্রাসাদ সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নানারূপ খেলা দেখাইবেন শুনিয়া রাজা বৃকভানু "বাহির দুয়ারে" বিচিত্র বিছানায় বসিলেন। জননীও সখীগণের সহিত রাধিকাও বাতায়ন পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলেন। মৎস্যাদি দশাবতার, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, ভগীরথাদি সূর্য্যবংশের রাজগণ একে একে প্রদর্শিত হইলেন। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণও আবির্ভূত হইলেন—শেষে—

তাহে অপরূপ, কৃষ্ণ অবতার, হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম, যেন নবঘন, জলদ সমান দেখা॥
যেমত অঞ্জন, দলিত রঞ্জন, কিবা অতসির ফুল।
যেন কুবলয়, দল সরোরুহ, যেমন কানড় ফুল॥
কোনরূপ যেন, নহে নিরুপম, দেখিয়াছে বহুরূপ।
বিবিধ বন্ধান, করিয়া সন্ধান, গড়ল রসের কূপ॥

চরণ যেমত, যাবক নিন্দিয়া, হিঙ্গুল দলিয়া বৈছে।
তাহাকে অধিক, বিম্বফল সম, দেখিতে না পারে কৈছে॥
তাহাতে রঞ্জিত, দশনখ চাঁদ, চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে, দশদিক্ শোভা, সকল করেছে আল॥
কনক কিঙ্কিণী, কলহংস জিনি, পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন, অঙ্গে সুলেপন, মৃগমদ আদি রাজে॥
বনমালা গলে, কিবা শোভাকরে, শোভিত কৌস্তভ তার।
যমুনাতে যেন, চাঁদ ঝলমল, দেখিয়ে তেমতি প্রায়॥
শিখী মনোহর, অধিক সুন্দর, শিরে পুচ্ছ শোভে তার।
শ্রবণে মকর, কুণ্ডল দোলয়ে, যেমতি রবির প্রায়॥
অধর বান্ধুলী, সুন্দর উপমা, দশন দাড়িম বীজে।
ভালে সে শোভিত, চন্দনের চাঁদ, তাহে গোরচনা সাজে।
নয়ন কমল, অতি নিরমল, তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি, অধিক দিয়াছে দেখা॥
নবগ্রহ বেড়ি, তাহার উপরে, মুকুতা সুসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক, মণির মালায়ে, বেড়িয়া তাহার মাঝে॥
বিচিত্র চামর, কেশের আঁটনি, বাঁধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম, অতি সে সুষম, তাহে মালা দিয়া বেড়া॥
তা'পরে ময়ূর, শিখণ্ড আরোপি, করেতে মোহন বাঁশী॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, কটাক্ষ চাহনি, অমিয়া মধুর হাসি॥
দেখিয়া সেরূপ, মদন মুরছে, কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস, জপতপ ছাড়ি, ওরূপ দেখিয়া কত॥
বৃকভানুপুরে, নাগর নাগরী, পড়িলে মুরছা খাই।
ঢলিয়া পড়িল, বৃকভানুরাজা, দ্বিজ চণ্ডিদাস গাই॥

এদিকে অন্দরে মহা হুলস্থুল। শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। তাঁহার নাই, নয়ন মুদিত। রাধিকার মাতা ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। একজন দৌড়িয়া গিয়া বৃকভানুকে সংবাদ দিল। তিনি আসিয়া ওঝা আনিয়া কার চৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওঝা অনেক মন্ত্র রণ করিল, অনেক ঝাড়াঝুড়া করিল। কিছুতেই রাধার চেতনা হইল কমলদল বিছাইয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল; সুস্নিগ্ধ চন্দন অঙ্গে লেপন হইল। অন্তরের অগ্নির তাপে সব শুখাইয়া গেল। আর রক্ষা নাই, বৃকভানুরাজার আদরিনী কন্তা জনমের মত চলিয়া গেল!

এদিকে রাজার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সুবল জানিতে পারিলেন

যে রাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানা আছে। রাধিকাকে দেখিলে আরোগ্য করিতে পারেন। তৎক্ষণ তাঁহাকে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। সুবল কত কি ঝাড়াঝুড়া করিয়া শেষে ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি কৃষ্ণ মন্ত্র দশবার রাধিকার কর্ণে কহিলেন। আরও বলিলেন,

সেই কৃষ্ণ হয়, পরম রতন, সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয়, ব্রজের জীবন, গোকুলে গোপী পতি ॥
সেই কৃষ্ণ হয়, অখিল শকতি, এই কৃষ্ণ রূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয়, গোকুল জীবন, যেই জন রাখে লেহা ॥
তখন যবে প্রবেশিল, কৃষ্ণ নাম কাণে, তখনি হইল ভান।
আখি দুই মিলি, করেতে করালি, দুখ অতি দূরে গেল ॥
চণ্ডীদাস বলে, চেতন হইল, সেই বৃকভানু বালা।
অঙ্গ মোড়া দিয়া, উঠিল চাহিয়া, দূরে গেল যত জ্বালা ॥

সুবল এইবার বৃকভানুকে পরামর্শ দিলেন, যে রাধিকাকে যমুনাতে স্নান করাইলেই আর কোন ব্যাধি থাকিবে না। তখন একমাত্র সহচরী সঙ্গে রাধিকা যমুনায় স্নান করিতে চলিলেন. পথে সুবল দাঁড়াইয়া ছিলেন। বংশীবট সমীপবর্ত্তী, সুকণ্ঠ বিহগকুলের মধুরকূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, পুষ্প সুবাসিত মধুর নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভগবানের নাম মাহাত্ম্য তিনিই প্রথমে কীর্ত্তন করিয়াছেন। উত্তরকালে প্রেমাবতার শ্রীগৌরচন্দ্র যে মন্ত্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত করেন আমাদের চণ্ডীদাস সেই মন্ত্রের গুরু।

অভিসার।

চন্দ্রালোকে বৃন্দাবন উদ্ভাসিত। রাধিকা কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিতেছেন না, তাই চন্দ্রকে কত তিরস্কার করিতেছেন। চন্দ্র বলিতেছেন :—

শুনগো রাধিকা, চাঁপার কলিকা, অধিক উজল কে।
শতকোটী চাঁদ, উদয় করেছে, একলা তোমার দে ॥
তুয়া এক পদে, চাঁদ শত বিন্দে, মস্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে, উছলি আকাশে, দেখিয়া ও রূপ আভা।
কে বা তোমার, অধিক উজর, তোমার অঙ্গের মালা।
বিধি আগে আনি, ভাজি খানি খানি, ধরে মোর বোলব ক.।

সিন্দুরের কেঁটা, অধরের ছটা, অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে, লক্ষান্তরে থাকে, আমি পক্ষান্তর লাখে॥
খঞ্জন গঞ্জন, ও যুগনয়ন, নাসা জিনি তিলফুল।
হেরিয়া বদন, আকুল মদন,কি আর দিব সে তুল॥
গৃধিনী জিনিয়া, শ্রবণ যুগল, নয়ান বয়ান প্রসা।
রূপের কথন, নহে নিরীক্ষণ, চণ্ডীদাস করে আশা॥

অভিসারের মোট চারিটি পদ আছে।

গোষ্ঠ লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, রাধিকা গবাক্ষ হইতে তাহা দেখিলেন। প্রেমময়ীর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইল, সারীকে ডাকিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নটবর রূপ দেখাইতেছেন। হায়! এই নবনীতকোমল তনু কেমন করিয়া গোষ্ঠের ক্লেশ সহ্য করিবে? প্রখর রবির কিরণে শ্রীকৃষ্ণ কত কষ্টই না পাইবেন! চরণ কমলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে। কংসের চর সর্ব্বদা ঘুরিতেছে তাহারা কখন কি অনিষ্ট করিতে পারে। পাছে এমন অমূল্য রতন হারাইয়া যায় সদাই এই আশঙ্কা।

হেন মনে করি, আঁচল থাপিয়া, আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে, ডাকা চুরি দিয়া, পাছে লয়ে যায় সখি।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে রাধিকা সখীগণের সহিত পশরা লইয়া বাহির হইলেন দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে মথুরা যাইবেন। পথে শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। "দান দাও তবে যাইতে পাইবে"—বলিলেন। এই উপলক্ষে কত কথা হইল। কত প্রেমকলহ হইল, শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন। কত আত্মনিবেদন হইল, প্রাণে প্রাণে বিনিময় হইল। এই অংশটুকু বড়ই মধুর। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধার করিলাম না।

তাহার পর নৌকা খণ্ড—অর্থাৎ রাধিকা বাটী ফিরিবার সময় যমুনা পার হইবেন, শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া পার করিতে আসিলেন। এই অংশেও অনেক ভাল পদ আছে।

বনভোজন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীদিগের নিকট হইতে অন্ন আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বালকদিগকে ভোজন করান।

ধেনু বৎস শিশু হরণ।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ধেনুবৎস শিশুহরণ, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ ইত্যাদি। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের গৃহে প্রত্যাগমন ও যশোদার খেদ। যশোদার খেদোক্তি অতি সুন্দর। ৮১টি পদে এই গোষ্ঠ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রাস লীলা।

১০৮টি পদে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ৭০টি পদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। পুঁথির ৮টি পাতা নাই, তাহাতে ২০টি পদ ছিল, অবশিষ্ট ১৮টি পদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই রাসলীলায় চণ্ডীদাস রচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; স্বভাব বর্ণনাতেও অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বনভোজন, বৎসহরণ ও রাসলীলায় চণ্ডীদাস ভাগবতের ঠিক অনুকরণ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে কবিসুলভ কল্পনার আকর্ষণে ভাগবত হইতে দূরে পড়িয়াছেন। কবির পক্ষে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

শরচ্চন্দ্রের সুবিমল শুভ্র কিরণে বৃন্দাবনের যাবতীয় বনস্থলী উদ্ভাসিত, কলকণ্ঠ বিহগকুলের কাকলীতে মুখরিত ও নানা বনফুলের সৌরভে আমোদিত। এ হেন সময়ে যমুনাতীরে রত্নবেদিকায় উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরবংশীধ্বনি করিলেন। বনস্থলী আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সানন্দে সমীরণ ভগবন্মুখনিঃসৃত এই মধুর পবিত্র ধ্বনি মস্তকে বহন করিয়া নাচিতে নাচিতে শ্রীরাধিকা ও গোপীগণের নিকটে উপস্থিত হইল। গোপীগণ আত্মহারা হইলেন। যে ভাগ্যবানের কর্ণে ভগবানের আহ্বান ধ্বনি প্রবেশ করে সে কি সংসারে স্থির থাকিতে পারে? গোপীগণ সব ভুলিয়া, আকুল হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সাগরগামিনী নদীর ন্যায় কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন।

ঐছন রমণী, মুরলী শুনিয়া, আকুল হইয়া চিতে।
নিজবেশ করে, মনের সহিতে, শুনিয়া মুরলী গীতে॥
রসের আবেশে, পদ আভরণ, কেহ বা পরিল গলে।
গলা আভরণ, কোন ব্রজবালা, পরিছে চরণে ভালে॥
বাহুর ভূষণ, কনক কঙ্কণ, পরিল হৃদয় মাঝে।
হিয়ার ভূষণ, পরিছে যতন, কটীতে ভূষণ সাজে॥
কেহ বা পরিল, একই কুণ্ডল, শোভই একহি কাণে।
ঐছন চলল, বরজ রমণী, ধৈরজ নাহিক মানে॥

এক করে পরে, কিঙ্কিণী কঙ্কণ, সিন্দুর পরল ভালে।
কোন জন পরে, নয়নে অঞ্জন, একহি নয়ন চালে ॥
নানা আভরণ, পরে কোন খানে, তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী, গমন করল, সেই বৃন্দাবন পানে ॥
কেহ নবরামা, বসন ভূষণ, উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে, আহীর রমণী, চলিয়া যাইতে নারে ॥

এইরূপে শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে করিয়া ব্রজনারীগণ চলিলেন। কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে রাধিকা চলিয়াছেন :—

চলল গমন, হংস যেমন, বিজুরী তেমন, উয়ল ভুবন,
　　লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল, ও চাঁদ বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর বিন্দু, তাহে বেড়ল কতেক ইন্দু,
　　কুসুম সুষম মুকুতা মাল, নোটন খোটন বাঁধিয়া ॥
বিম্ব অধর উপমা জোর, হিঙ্গুলে মণ্ডিত অতি সে ঘোর,
　　দশন কুন্দ যেমন কলিকা, কি বা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল, নাসিকার পর বেশর আর,
　　মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল, দেখহ বেকত ভালিয়া ॥
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত, অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত,
　　রসভরে ধনী সুন্দরী রাই, চলল মরমে মাতিয়া।

ব্রজনারীগণ যমুনাপুলিনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। "তোমরা কুলবধূ, এখানে কেন আসিয়াছ? গৃহে ফিরিয়া যাও।" কথাগুলি অশনিসম্পাতের ন্যায় গোপীকর্ণে পতিত হইল। হায়! তাঁহাদের সকল আশা ফুরাইল। তাঁহারা যে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু জানেন না। কৃষ্ণ ছাড়া যে জগতে আর কিছু দেখিতে পান না। এক তিল অদর্শনে তাঁহাদের প্রাণ যে ভাঙ্গিয়া যায়! সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন! গোপীগণ কত অনুনয় করিলেন, কত কাঁদিলেন। নিঠুর হরি কিছুতেই দয়া করিলেন না। তখন রাধিকার মনে মানের উদয় হইল। বিমুখী হইয়া মাধবী তলায় বসিলেন। রাধিকার মান কিছুতেই ভাঙ্গে না। শ্রীকৃষ্ণ বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনিও [illegible] রাধা ছাড়া থাকিতে পারেন না। অগত্যা নিকুঞ্জে বসিয়া,—

বাঁশী মুখে দিয়া　　　ব্যথিত হইয়া
　　পূরত সুস্বর বাণী।

কেবল রাধা রাধা গান করিতে লাগিলেন। অঙ্গের বসন ভূষণ কোথায় গিয়াছে তাহার স্থির নাই। বিহ্বল হইয়া ভগবান কেবল রাধা নাম গাইতে লাগিলেন।

এ দিকে সখীগণ রাধিকাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল—কত বুঝাইল, কিছুতেই রাধিকার মানভঙ্গ হইল না। তখন একজন সখী গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দিল যে তাঁহাকে স্ত্রীবেশে রাধিকার নিকটে যাইয়া গান গাহিয়া রাধিকাকে মোহিত করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অগত্যা সম্মত হইলেন। নবীন নটবর বেশ ত্যাগ করিয়া জগৎস্বামী স্ত্রীবেশ পরিধান করিয়া রাধিকার সমক্ষে বীণা হস্তে উপস্থিত হইলেন। কত পূরবী, সিন্ধুড়া কেদার, পাহিড়া, দীপক রাগ বাজিল, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে রাধিকার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি আত্মবিস্মৃতা হইয়া গায়িকাবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সকল ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কত লীলা করিলেন। রাধিকা বংশীবাদন শিক্ষা করিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে নিজের ধড়া চূড়া দিয়া সাজাইয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান করিয়া বাঁশী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাধিকার হস্তে বাঁশী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ডাকিতে লাগিল। রাধা নাম কিছুতেই বাজিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা দুইজনে এক রন্ধ্রে ফুঁ দিতে লাগিলেন। তখন 'রাধাকৃষ্ণ' যুগল নাম ধ্বনিত হইয়া কানন ও আকাশ পূরিয়া গেল। জগতে অতুল আনন্দ লহরী বহিল। যমুনা উজান বহিল—শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইল। সংসার-ক্লিষ্ট জীবের পরিত্রাণের উপায় হইল।

তাহার পর নিকুঞ্জে সহর নির্ম্মিত হইল। রত্ন সিংহাসনে শ্রীমতী রাজা হইলেন। আর কৃষ্ণ সহর কোটাল অর্থাৎ (Police Superintendent) হইলেন। রাজা হইলেই 'টুরে' বাহির হইতে হয়। শ্রীমতী একবার 'টুরে' বাহির হইলেন। সাধ পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণের বামে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। তখন চণ্ডীদাস সুযোগ পাইয়া প্রাণ ভরিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণনা করিলেন। আমাদের দুর্ব্বোধ কথায় কত ভগবত্তত্ত্ব কহিলেন।

কালার ছটারে, কালরূপ ধরে, এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে, গৌর বরণ, ধরিয়াছে অবহেলে॥
সখীর বচন, হাসিয়া সঘন, "সকলি গৌর দেখি।"
আপনার দেহ, দেখল গৌর, দেখল সকল সখী॥

নিকুঞ্জ ভুবন, সেইত গৌর, গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর, দেখল যেকত, গৌর আপন তনু॥
সকল গৌর, দেখিয়ে সখিনী, মনেতে লাগল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে, ও নব নাগর, গৌর হইল কুঞ্জ॥

এইবার ভক্ত, বলুন দেখি ইহাতে আমাদের প্রেমাবতার গৌরহরির আবির্ভাব-সূচনা হইতেছে কি না? ভক্ত চণ্ডীদাস, সাধক চণ্ডীদাস, এইরূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পর একশত রমণী মিলিত হইয়া কুঞ্জর রূপ ধারণ করিলে রাধাকৃষ্ণ তাহার উপর আরোহণ করিয়া কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই খান হইতে পুঁথিতে ৪০টি পদ নাই। তাহার পর দেখিতে পাই কোন গোপী বনভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করিতে বলায় তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সহসা অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীগণ যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিলেন। তখন আর দয়াময় হরি থাকিতে পারিলেন না। যে ভগবানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, ভগবান তাহাকে নিশ্চয়ই কোলে করেন। শ্রীহরি গোপীগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। গোপীগণের বাসনা পূর্ণ হইল, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হইল। ব্রজলীলা অবসান হইল।

অক্রূরাগমন, বৃন্দাবনে শোকোচ্ছ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন, আর কংস মথুরায় রাজ্য করিতেছে। কিন্তু তাহার মনের শান্তি নাই। পাপী ভগবানের ভয়ে সদাই উদ্বিগ্ন থাকে। সে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শিশু শ্রীকৃষ্ণের বধসাধন করিতে পারে নাই। শেষে স্থির করিয়াছে এক যজ্ঞ করিয়া কৃষ্ণবলরামকে নিমন্ত্রণ করিবে, ও নিজ গৃহে পাইয়া তাঁহাদের বধ করিবে। এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসিবার জন্যে অক্রূরকে আদেশ করিল। মহানন্দে অক্রূর এ কার্য্যে সম্মত হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অক্রূরের মনে কত আনন্দ, কত আশা।

আজু দেখব, চরণ দুখানি, লোটায়ে পল্লব তায়।
প্রেমে কত শত, প্রণাম করিব, ও দুটি কমল পায়

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রথারোহণে নন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নন্দ বিশিষ্ট অতিথির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অক্রূরাগমন বার্ত্তা শুনিলেন। তখন অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বার্ত্তা প্রচার করিলেন। সমস্ত বৃন্দাবন যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল! যশোদা, গোপীগণ ও রাখালবালকগণের বিলাপে আকাশ পরিপূরিত হইল। এইরূপ শোকচিত্র সাহিত্যে বিরল। প্রত্যেক পদগুলিই অতি সুন্দর। আমি যেখান সেখান হইতে দুই একটা উদ্ধার করিয়া দেখাইব। ১০০ শত পদে এই শোকচিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মধুপুর গমনোচিত বেশ দেখিয়া যশোদা কাঁদিতেছেন ঃ—

(১)

"কোথারে সাজিয়াছ,
কাহার জনম, সফল করিতে, এ বেশ বনায়েছ।"
চাঁদমুখ চেয়ে, যশোদা জননী, পড়ে মুরছিত হয়ে।
"কেমনে বাঁচিব, তিলেক না জীব, দেখহ বেকত হয়ে॥
কিসের কারণে, এ বর করণে, আগুণি ভেজায়ে দিয়া।
তোমার বিহনে, মরিব সঘনে, যাব সে বাহির হয়া॥
কেবল নয়ান, তারার পুতুলি, তোমা না দেখিলে মরি।
যখন দেখিয়ে, ও চাঁদ বদন, তবে সে চেতন ধরি॥
যবে যাহ গোঠে, ধেনুগণ লয়ে, সেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে, কুশলবারতা, শুনিয়ে বেণুর সান॥
অনেক তপের, ফল পরশনে, পাই সে তোমা সে ধনে।"
বিহি নিকরুণ, এসে সে আনিল, দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(২)

কোলে লয়ে যাদুমণি, বদন চুম্বয়ে রাণী, দরদর বহে প্রেম বারি।
ধরিয়া গোপাল করে, কাতর হইয়া বলে, দুই বাহু ধরিয়া পশারি॥
শ্রীমুখ মণ্ডল দেখি, তাহাতে নয়ান রাখি, পড়ে রাণী মুরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কান্দে, থির নাহিক বাঁধে, গোপী রহে চাঁদ মুখচেয়ে॥
গোপের রমণীগণ, সবে হৈয়ে একমন, ধূলায় ধূসর কলেবর।
"কে আর করিবে খেলা, হইয়া বালক মেলা, কারে দিব ছেনা ননী সর॥
কে আর যাইয়া ঘরে, মহটা লইয়া করে, এ সর নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়া মায়, কোথারে যাইতে চায়, মায়ের অন্তরে দিতে দুখে॥
কহে কত নন্দ ঘোষ, কারে কত দিব দোষ, আমার করম হীন বড়ি।
নয়ন ছাড়িয়া গেলে, কি কাজ জীবনে বলে, উচিত মরিতে হয় ভারি॥

নন্দ বলে শুন রাণী, এই মনে অনুমানি, চলে যাব বাহির হইয়া।
কিবা ঘরে আছে সাধ, ঘটিল সে দিন বাদ, চণ্ডীদাস পড়ে মূরছিয়া॥

রাখাল বালকগণ শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতেছেন ঃ—

গদগদ বোলে, "শুন বাঁশীধর, কোথাকারে যাবে তুমি।
এ ব্রজ বালক, করিয়া বিকল, কিছু না জানিয়ে আমি।
কেমন তোমার, চরিত ব্যাপার, এই সে করিলে পাছে।
তবে কেন এত, প্রীত বাড়াইলে, থাকিব কাহার কাছে॥
স্বপন নয়নে, ভোজন গমনে, সদাই তোমারে দেখি।
কেমনে তোমার, লেহ পাশরিব, শুনহে কমল অাঁখি॥"
কাঁদে শিশুগণ ; হয়ে অচেতন, শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে।
কেহ কোথা পড়ে, নাহিক সংবাদ, অতি সে বেদন পেয়ে॥
কেহ বলে ভাই, "আর না শুনিব, মধুর মধুর বাণী।
আর না খেলিব, ধেনু নিয়োজিয়া, না নিব বাঁশীর ধ্বনি॥
ভাই ভাই বলি, আর না শুনিব, বিহানু বৈকাল বেলে।"
চণ্ডীদাস কহে, অতি বড় মোহে, পড়িয়া চরণ তলে॥

সুবল বলিতেছেন,—

যখন করিলে, বনে অতিসুখ, লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর, বধিলে নিঠুর, হা'য় বালকের মেলা॥
যে দিনে কালিন্দী, দহের সম্মুখে, সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া, সেখানে বালক, সবে তনু তেয়াগিল॥
কূলে পড়ি সবে, মরিল বালকে, তুমি সে গেছিলা কতি।
আসিয়া দেখিলে, কিবা মাত্র দিলে, করিলে সবার গতি॥
কেন বা জীয়ালে, এ দুখ দেখিতে, তখনি মারিতে ছিল।
মথুরাগমন, করিবে এখন, ইহাই দেখিতে হ'ল॥
কেমনে বঞ্চিব, তোমা না দেখিয়া, শুনহে কানাই ভেয়া।
নিঠুর নহিও, বচন কহিও, কহত বদন চেয়া॥"
এ যদুনন্দন, না ফুরে বচন, হেটমাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব, মুখে নাহি বাণী, পূরল বিরহে তনু॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে বচন, চলহ যমুনা জলে।
ঝাঁপ দিয়া মরি, করিয়া ধেয়ান, সুবল ইহাই বলে॥

রাধিকা কাঁদিতেছেন,—

রাধা বলে শুন, রসিক নাগর, মোর সে কোন বা গতি।
তুমি দয়ানিধি; সব পরিহরি, রাখিয়া চলহ কতি॥

প্রেম বাড়াইলে, অমিয়া সিঞ্চনে, করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন, তোমার ধরম, পরিণামে দিলে দুখ ॥
মোরে লেহ সাথ, শুন যদুনাথ, সাধ পড়ায়ে যাব।
এ দুখে এবে সে, তোমার বিহনে, কেমন করিয়া রব ॥
শাশুড়ী তাপিনী, ননদী পাপিনী, তাহা সে সকল জান।
তোমার চরণে, এ দেহ সঁপেছি, তাহে নিদারুণ কেন ॥
তোমা না দেখিলে, তিলেক না জীব, মরিব তোমার গুণে।
এমন পিরিতি, নাহি দেখি কতি, দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

কোন কোন পদে একটু তিরস্কারের ছায়া আছে—তাহা থাকিতে পারে কিছু অন্যায় হয় নাই।

যে দিন হইতে, তোমার সহিতে, পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন, রয়েছে ঘোষণ, যেমত শেলের রেখা ॥
শপথি করিয়া, পিরিতি করিলে, তাহা বা রাখিলে কৈ।
কে আছে বেথিত, কাহারে কহিব, যে দুখে আমরা রই ॥
আপনি বলিলে, আপনি করিলে, আবার এমত কর।
আমরা হইলে, মরিয়া যাইতাম, পুরুষ বলিয়া সার ॥
একটি বচন, করি নিবেদন, শুনহে নাগর রায়।
সে দিন যাইয়া, কি কাজ লাগিয়া, ধরেছিলে দুটি পায় ॥
দোসর বচন, করি নিবেদন, শুনহে নন্দের সুত।
সে দি ন যাইয়া, কিসের লাগিয়া, দশনে ধরিলে কুট ॥
তেসর বচন, করি নিবেদন, দাঁড়ায়ে শুনহে তুমি।
এ জনমের মত, ফিরে যাও তুমি, বিদায় হয়ে যাই আমি ॥
এ কথা শুনিয়া, রসিক নাগর, ভাসিল নয়ানের জলে।
রসিক নাগর, হইল কাতর, দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

নিঠুর কানাই কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না, রথের উপর বসিলেন

হেনক সময়, সারথি তুরিত, চালায়ে সুন্দর রথ।
সব গোপীগণ, হইয়া বিমন, সবে আগুলিল পথ ॥
দুবাহু পশারি, নবীন কিশোরী, পড়ল রথের তলে।
"যাহ যাহ দেখি, রাধারে মারিয়া," সকল গোপিনী বলে ॥
পড়ল রথের, চাকার সমুখে, অবলা অথলা রামা।
বধ করি যাহ, এ সব গোপিণী, জানিল তোমার প্রেমা ॥
চণ্ডীদাস দেখি, রাধার হুতাশ, বিরহ বেদন চিত।
গিয়া শ্যাম পাশে, কর জোড় করি, বুঝাইছে কোন রীত ॥

রথ বৃন্দাবনচন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া চলিল, তখন—

ধেনুগণ সব, করি হাম্বারব, মথুরা মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি, বিয়োগ পাইয়া, সেও দুধ নাহি খায়॥
পুচ্ছ উচ্চ করি, মায়ে পরিহরি, মথুরা গমন দিগে।
যথা সে রসিক, নাগর শেখর, সে দিক গমন ভাগে॥
খগ মৃগগণ, রোদন বেদন, আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ, শ্যাম শ্যাম করি, রাতি দিন নাম লয়॥
মৃগগণ অতি, চেয়ে আছে কতি, নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে, পেয়ে অতি মোহে, এ সব হৈলা ভোর।
সেই পিকু রবে, এ পঞ্চ শবদে, শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ, নাহিক আপদ, সে ডাল চলল ছাড়ি॥
ভ্রমর ভ্রমরী, সদাই গুঞ্জরী, সদাই শবদ করে।
চকোর ডাহুকী, চাতক চাতকী, তাহা না শবদ করে॥
হংস হংসিনী, শুক শারী গণি, তাহা না শব্দ একে।
নিশব্দ হই, নিরন্তর রোই, না জানি কোথায় থাকে॥
পুরবাসী যত, অন্ধর নয়ন, যুবা বৃদ্ধ বাল যত।
শোকেতে আকুল, বিয়োগ সকল, তাহা বা কহিব কত॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী, ধৈরয করহ মন।
হেনবাসি চিতে, দেখহ বেকতে, মিলব সে রস ধন॥

স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী রাধিকা ও প্রাণ সখা রাখালগণের অশ্রু উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথ হরি, জগতের অপর হিতের জন্য মথুরায় আসিলেন। মথুরার নরনারী ভগবানের সেই মনোমোহন রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিতে লাগিল :—

এমন রূপের ছটা।
ভুবনমোহন, বেশ করেছে, যেমন মেঘের ঘটা।
বনফুলে, চূড়া বাঁধে, কিবা ছলে নাট।
সোণার খোপে, কসে' বাঁধে, যেন মুকুতার হাট॥
মণিমাণিকে, গাঁথা মালা, তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ুর পাখা, উড়ে বায়ে, কিরণ-মাখা চূড়া॥
কোন যুবতী, বাঁধে চূড়া, সেই সে আপন মনে।
হাসির ঠাটে, জগৎটুটে, মধুখায় ঘনে।
গলায় মালা, ভুবন আলা, হাতে মোহন বাঁশী।

মদন দেখি, রূপ রাখি, মাঝারে জলদ পশি
প্রেম নাগরীর, কথা শুনে, কহে চণ্ডীদাস।
ওরূপ দেখি, কোন যুবতী, চলে' যাবে বাস॥

এইবার রজকের বস্ত্র হরণ, কুব্জার নিকট হইতে গন্ধমাল্য পরিধান ও কংস বধ হইল। তাহার পর দৈবকী বসুদেবের বন্ধনমুক্তি। দৈবকী বসুদেব বলিতেছেন :—

"এত দিন ছিলে কোথা,
ছাড়িয়া জননী, বাছা যাদুমণি, হিয়ারে মারিয়া ব্যথা॥
ও মোর বাছনি, চাঁদমুখ খানি, দেখিয়ে নয়ান ভরি।
দুষ্ট কংস লাগি, তোমা হেন পুত্রে, ভেজল গোকুল পুরী॥
শোকেতে আকুল, পরাণ বিকল, এই দেখ তনুসারা।
যেন আঁখে আসি, তারা দুটি বসি, দেখিল উজোর পারা॥

ব্রজলীলার অবসান হইয়াছে। কৃষ্ণবলরাম আর ত বৃন্দাবন যাইবেন না, নন্দঘোষ তাঁহাদের সঙ্গে মথুরা আসিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে এই নিদারুন কথা বলা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ধরিয়া নন্দকে এ কথা বলিতে পারিবেন না। বলরাম কিন্তু বলিয়া ফেলিলেন। নন্দের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। নন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনা পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

এই সে তোমার, মনেতে আছিল, রহিতে মথুরা পুরে।
রাখিয়া এখানে, হিয়ার পুতলি, কেমনে যাইব ঘরে॥
কিবা লয়ে আনু, কিবা লয়ে যা'ব, কিবা যে বলিব লোকে।
যশোদা রোহিণী, গোপের রমনী, কি তারা বলিব মোকে॥"

যাহা হউক অনেক বুঝাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান গিয়া নন্দকে বিদায় করা হইল। নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে নন্দ ফিরিয়া আসিলেন। নন্দের শকট ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া বৃন্দাবনের আবলবৃদ্ধ বণিতা কৃষ্ণ আসিতেছেন ভাবিয়া ঘরের বাহির হইল। "কৃষ্ণকে কেন দেখিতেছি না" বলিয়া যশোদা বিলাপ করিতে লাগিলেন। নন্দ কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া শকট হইতে পতিত হইলেন। যশোদা বলিলেন :—

কি লয়ে আইলে তুমি,
এ যার করণ, লয়ে তেয়াগিয়া, জলে প্রবেশিব আমি॥

অঞ্জনার নড়ি, বাছারে কানায়া, কোথা না রাখিয়ে এলে
কেমনে বাঁচিব, তারে না দেখিয়া, বড় দুখ মনে দিলে ॥
কোথা হতে এল, রাজা কংসদূত, অক্রূর তাহার নাম।
শমন সমান, প্রবেশি গোকুলে, লইল সবার প্রাণ ॥"

ব্রজনারীগণের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ঃ—

যেমন সোণার, পুতলি ধূসর, অবনী উপরে দেখি।
নয়নের জলে, তিতিয়া বসন, যমুনা তরঙ্গ দেখি ॥
কেহ কার অঙ্গে, অঙ্গ হেলাইয়া, মুদিয়া নয়ান দুটি।
যেমন চামরু, তাহার চামর, অবনী মাঝারে লুটি ॥
যেমন ধাইল, হইয়া পড়িল, খাইয়া ব্যাধের শর।
তেমত বিরহ, বাণে তনু জর, না চিনে আপন পর ॥
আন বাণ যদি, অন্তরে পৈশয়ে, তখনি তেজয়ে তনু।
এ বড়ি বিষম, নহে নিদারুণ, হিয়ায় পৈশয়ে জনু ॥
চণ্ডীদাস বলে, কি আর বাঁচিব, এ হেন, বিরহ শরে।
আনল জ্বালিয়ে, তাহে প্রবেশিয়ে, কিছার জীবন ধ'রে ॥

এই সব ছাড়া প্রেমবৈচিত্ত, মান ও রাগাত্মিক পদেও অনেক নূতন পদ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধার করিলাম না। *

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ।
রামপুরহাট।

বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চা।

বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইলেও, তাহার প্রকৃষ্ট সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও যে কত সহস্র সহস্র প্রাচীন ও অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পুঁথি কাষ্ঠ-চাপের কবল-বদ্ধ রহিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে ধ্বংশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের পরিষৎ কর্ত্তৃক তৎসমুদয়ের উদ্ধার সাধন হইলে, অনুসন্ধান দ্বারা বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার হইলে,

* "বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের" ২য় মাসিক অধিবেশনে (শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল) লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত।

—আমরা আমাদের দেশের সাহিত্য-চর্চ্চার কতকটা ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনে সমর্থ হইব।

অদ্য আমরা যে কয়জন গ্রন্থকারের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া ধন্য হইব, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন-মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া সমগ্র দেশের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু, নিবিড় শ্যাম-শোভার মধ্যবর্ত্তী সুদূর-সংস্থিত গগনস্পর্শী সুবিশাল বনস্পতি নিচয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেমন তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব কল্পনা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, তদ্রূপ আমরা এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন, আমাদের বীরভূমের সাহিত্যিকগণের চতুঃপার্শ্বে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ কবিবৃন্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বহু আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। এখন, আমরা সেই কল্পিত কবি-কাননের সুখ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিবার আশায় ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া চলিয়াছি। বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণে যদি কখন আমরা সেই মানস-কাননের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি, তখন সেই শুভ দিনে আমরা কবি-কাননের যথাযথ বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়া ধন্য হইব। সুতরাং, আমাদের অদ্যকার চেষ্টা, বীরভূমে সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাস নহে—সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইবার কারণ নির্দ্দেশমাত্র।

সাময়িক বিপ্লবের ক্ষণিক উত্তেজনায় বীরভূমবাসী নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট, এ অনুযোগ যেরূপ সত্য,—সমাজের মঙ্গলকর, জাতির উন্নতিকর, নিত্য ও সুন্দর সৎ-সাহিত্যের আলোচনায় বীরভূমবাসী আবহমানকাল ধীরক্ষেপে ও দৃঢ়পদে অগ্রসর—এ কথাও তদ্রূপ ইতিহাস ও অনুসন্ধান দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রমাণীকৃত।

বীরভূমবাসী কোন কালেই ব্যহ্যিক উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া স্থানচ্যুত বা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া দূরদূরান্তরে ভাসিয়া যায় নাই। কোন কালেই তাঁহারা তাঁহাদের বহু সাধনার ধন, সুন্দরের উপাসনা, সত্যের আলোচনা—সাহিত্য সেবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় নাই। কিঞ্চিন্মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিব।

আমাদের দেশ ধর্ম্ম-প্রধান দেশ। ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। যে ধর্ম্ম যে সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,—সাহিত্য সেই ধর্ম্মের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া তাহার [illegible] হইয়াছে। কালের

চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও পতন সংঘটিত হইয়াছে—কোন কোন ধর্ম্মমতের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সাহিত্য, সেই সেই ধর্ম্মের নিদর্শন, সংরক্ষিত করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজ অঙ্গ পরিপোষণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

বীরভূমি, এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের লীলাভূমি ও প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র। অতীব প্রাচীনকালের কথা এখনও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের আলোচনা দ্বারা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা, অন্যূন সহস্র বৎসরের কথা, আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে যথাক্রমে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া সাহিত্য মধ্যে তাহার স্থায়ী নিদর্শন রক্ষা করিয়া গিয়াছে। আমরা এই বিষয় একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের জন্য বীরভূমির বর্ত্তমান অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত আয়তনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রহিয়া ইহার পূর্ব্বতন সুবিস্তৃত আয়তন, বৈদ্যনাথের প্রান্তসীমা হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পরিসর ক্ষেত্রের কথা লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৌদ্ধধর্ম্ম এখন আমাদের দেশ হইতে একবারে বিতাড়িত হইলেও, ইহা আমাদের দেশে যে এককালে বিশেষরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন, বৌদ্ধ প্রাবল্যের সহস্র বৎসর পরেও প্রতি পল্লীতে দেখিতে পাইতেছি। ইহা এখন অভ্রান্ত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমাদের দেশে ধর্ম্ম-পূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। আমাদের বীরভূমে এমন পল্লী নাই যেখানে ধর্ম্মরাজ পূজার ব্যবস্থা নাই। এই ধর্ম্মপূজার প্রচলন জন্য বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্ম-মঙ্গল বা তৎভাবসূচক বহুগ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ধর্ম্মমঙ্গলাখ্য গ্রন্থরচয়িতাগণের মধ্যে "ময়ূর ভট্ট" আদি কবি বলিয়া স্বীকৃত। প্রসঙ্গক্রমে, ময়ূরভট্টের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার রচিত গ্রন্থ কেহ দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচয় অবগত হইবার সুযোগ এযাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আমরা এই বীরভূমে সেই ময়ূর ভট্ট বিরচিত বিপুলকায় ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম —বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এই ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি বিরচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, বীরভূমবাসী অনেক

ধর্ম্মপূজক, ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্ম উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। বীরভূমে প্রতিষ্ঠান্বিত ধর্ম্মরাজ পূজার মন্দিরেরও অভাব নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপের পর হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বীরভূমে বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর এবং অন্যান্য শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা-ক্ষেত্র দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বীরভূমবাসী বিরচিত শিবায়ন গ্রন্থের অভাব নাই। এখনও পর্য্যন্ত ভিক্ষুকগণ অতি প্রাচীনকালে বিরচিত শিবমাহাত্ম্যসূচক গ্রাম্য কবির গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে।

শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য মন্দীভূত হইলে শাক্ত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। বীরভূমে শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য, বীরভূম অন্তর্গত তারাপুর, ফুল্লরা, কঙ্কালী প্রভৃতি পীঠ স্থানের নামেই সুপ্রকাশ। চণ্ডীমাহাত্ম্য বা দুর্গামাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থ বীরভূম বাসীগণ বঙ্গসাহিত্যে উপহার দিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

শাক্ত ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময়, যখন ধর্ম্মের নামে ব্যাভিচার-স্রোত অবাধগতি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রবল-শক্তির আবির্ভাব হইবার সূচনা হইল। শক্তি-পূজকগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহাত্ম্য গান করিয়া ব্যাভিচার তরঙ্গের বিরুদ্ধে উজান বাহিয়া সমগ্রদেশ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিবার উপক্রম করিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, বীরভূমবাসী জয়দেব ও চণ্ডীদাস এই প্রতিক্রিয়ার সাধক এবং প্রবর্ত্তক। জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদ্বয়, 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচয়িতা জয়দেব এবং ভগবৎপ্রেমের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণকারী—যাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ আকুল" করিতে থাকে, সেই অদ্বিতীয় কবি চণ্ডীদাস, সাহিত্যে যে কি স্বর্গীয় সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক মনে করি না।

বীরভূমবাসীর সেই এক স্মরণীয় দিন, যে দিন চণ্ডীদাসের প্রবল আকর্ষণে সুদূরবর্ত্তী মিথিলা প্রদেশ হইতে অপর এক শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি, বীরভূমে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য এই কবি-মিলনের নিদর্শন রাখিতে বিস্মৃত হন নাই—আমরা এই কবিযুগলের মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়া যাই। ভগবৎপ্রেমে অনুপ্রাণিত অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভাশালী, এই কবিযুগলের সম্মিলনে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও

ভগবত্তত্ত্ব আলোচনায় পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল—তাহার লক্ষাংশের একাংশ পরিমাণও বর্ত্তমান যুগের সুধী-সম্মিলনে সংসাধিত হইতেছে কি না ভাবিবার কথা।

যখন, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিত্বশক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের পুণ্য-প্রভাবে হৃদয়হীন দেশ সম্যক্‌রূপ কর্ষিত হইয়া গেল, সেই সময় বীরভূমে একচক্রায় প্রেমের অবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাব হইল।

চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাস্বর দীপ্তালোকের রশ্মি-রেখা-সম্পাতে প্রেম-সরোবরে অগণিত শতদল যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্রভুবন আলোকিত এবং অপূর্ব্ব সৌরভে ক্ষুদ্র মানব-চিত্তকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। নিতাইচাঁদের স্নিগ্ধ-রশ্মির সুখস্পর্শে একবারে শতশত কুমুদ দিগদিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। গৌর নিতাইয়ের প্রেম-পীযুষ ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া ক্ষীণ-প্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের মুগ্ধচিত্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিল—দেশময় গ্রামে গ্রামে, একাধারে ভক্ত-কবি ও প্রেমিকের উদ্ভব হইল।

প্রেমাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মে পবিত্রীকৃত বীরভূমি, এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। তাঁহারা এই দেশপ্লাবী অমৃতস্পর্শী প্রেম-বন্যায় অভিসিঞ্চিত হইয়া সেই প্রেম-প্রকাশের চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের যে কিরূপ পরিপুষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তৎকালীন বীরভূমের অন্তর্গত সমগ্র মনোহরসাহী পরগণা তারস্বরে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে গান ধরিলেন, তাহার আর তুলনা নাই। আমাদের জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ দাস, লোচনদাস, জগদানন্দ, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণব কবির নাম করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পরম বৈষ্ণব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রবর্ত্তিত গড়ানহাটী এবং আমাদের বীরভূমের অন্তর্গত মনোহরসাহী পরগণার দেশবিখ্যাত জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিবৃন্দ প্রবর্ত্তিত মনোহরসাহী কীর্ত্তনই প্রধান। এতদুভয়ের মধ্যে আবার মনোহরসাহী কীর্ত্তনের প্রধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তকগণ বঙ্গসাহিত্যে যে পদাবলী-সাহিত্য উপহার দিয়াছেন, তাহা জগতের যে কোন সাহিত্যে দুর্লভ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচক্রা বীরচন্দ্রপুরে পরমবিরক্ত শ্রীলনরো-ত্তম ঠাকুর, দাসঠাকুর, শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রকৃতি বৈষ্ণব মনস্বী বৃন্দের

সম্মিলনে ভগবৎমাহাত্ম্যসূচক গীতরচনায় এবং ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্গসাহিত্যের যে অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদীসম্মত।

এই সময় হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয়ে রহিয়া বীরভূমের প্রায় প্রতি পল্লীতে নিভৃতে বসিয়া কতকত কবি যে সঙ্গীত ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধানে যখনই যে গ্রামে গিয়াছি কোথাও কোন অপ্রকাশিতনামা কবির অপ্রকাশিত পূর্ব্ব গ্রন্থ সন্ধান করিতে অকৃতকার্য্য হই নাই। এক বীরভূমি অনুসন্ধান করিলে সহস্রাধিক নূতন বৈষ্ণব কবির অবিষ্কার হওয়া বিস্ময়ের কথা বলিয়া মনে করি না।

অনুসন্ধানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য খ্যাতনামা কবি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নাই।

লৌকিক ধর্ম্মালোচনায় বীরভূমি নিশ্চেষ্ট নহে। মনসা, শীতলা, ওলা প্রভৃতি দেবতার পূজা বীরভূমে যথেষ্টরূপ প্রচলিত আছে। ইতর শ্রেণীর মধ্যে এই সকল লৌকিক দেবতার পূজা পদ্ধতি আবদ্ধ রহিলেও, ইহাদের মহাত্ম্য সূচক গ্রন্থের অভাব নাই। মনসার মাহাত্ম্যপ্রচারক গ্রন্থ "মনসা মঙ্গল" বহুকবি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজপর্য্যন্ত ষাট সত্তর জন "মনসা মঙ্গল" রচয়িতার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, আমাদের বীরভূমে বিষ্ণুপাল বিরচিত "মনসামঙ্গল" গ্রন্থ, উপাখ্যান বর্ণনায় অপরাপর গ্রন্থাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ। এই গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত; এমন কি, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের লেখকের, পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চার বিষয় অজ্ঞতা নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

জাতিবিজ্ঞানবিষয়ক কুলজীশাস্ত্র প্রসঙ্গে বীরভূমবাসী শ্যামদাস, ঘনশ্যাম-মিত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা, সুদামা চরিত্র প্রভৃতি সন্দর্ভ-শাখায়ও বীরভূমবাসী রামভদ্র, অমরসিংহ, দ্বিজপরশুরাম প্রভৃতি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন

ভারতচন্দ্রীয় যুগে, ভাষার মধ্যে যখন অজস্রভাবে অবাধগতিতে অশ্লীলতার প্রখর স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে ভারতচন্দ্রেরই বংশের বীরভূমবাসী অপর এক কবি গঙ্গানারায়ণ অশ্লীলতা-বিবর্জ্জিত 'ভবনীমঙ্গল' নমক সুবৃহৎ সুলিখিত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তৎকালে বীরভূমবাসীর এই মার্জ্জিত রুচির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমরা

স্তম্ভিত হইয়াছি। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি এ যাবৎ অপ্রকাশিত ছিল—অচিরে বীরভূম পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। তখন আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, যে অশ্লীলতা এই যুগের নিদর্শন বলিয়া এতদিন বিঘোষিত হইতেছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক নহে—তাহা ধনীবিশেষের অমার্জ্জিত রুচি, কতিপয় কবির দুষ্ট রচনা মাত্র।

এই সময়ে, কবি সঙ্গীত রচয়িতাগণের আবির্ভাব। আমাদের বীরভূমে নন্দলাল প্রভৃতি কবিসঙ্গীত রচনা করিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

যাত্রার পালা রচনার প্রবর্ত্তক পরমানন্দ অধিকারী বীরভূমেরই অধিবাসী।

বীরভূমবাসী মহারাজা নন্দকুমার, কালীপ্রসন্নপ্রভৃতি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

চরিতগ্রন্থরচয়িতাগণের মধ্যে "জয়দেব চরিত্র" রচয়িতা বনমালি দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য

এতদ্ব্যতীত, বীরভূম বাসী কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থাৎ বঙ্গভাষার কবিতায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অল্প নহে। রাসদাস বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ এবং গিরিধর প্রণীত গীতগোবিন্দের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গিরিধরের অনুবাদের কৃতিত্ব দেখুন. সেই সর্ব্বজন বিদিত "যদি হরি স্মরণে সরসংমনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ কেমন যথাযথ ও প্রাঞ্জল—

শুন কৃষ্ণভক্তগণ আমার বচন,
যদি কৃষ্ণ স্মরণে সরস হয় মন,
কৃষ্ণ লীলা বিলাস কলাতে সুনিশ্চয়,
যদি তোমাদের চিত্ত কুতুহল হয়;
তবে দেহ মন জয়দেব কবিতাতে
মধুর কমনীয় কৃষ্ণরস পদ যাথে॥

এই গ্রন্থদ্বয় এখনও অপ্রকাশিত।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে, এই সিউড়ির সন্নিকট কড়িধার সেন পরিবারোদ্ভব স্বর্গীয় বিনোদ রাম সেন এবং স্বর্গীয় ব্রজমোহন সেন মহাশয় দুর নিভৃত পল্লীতে বসিয়া যে সাহিত্য চর্চ্চার প্রচেষ্টা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা নিজে কবি ও গ্রন্থকার—বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধানতম

গৌরবের কথা—তাঁহারা বীরভূমবাসী কবি পণ্ডিত বীরভদ্র গোস্বামী দ্বারা সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গভাষায় যথাযথ পদ্যানুবাদ করাইয়া উপযুক্ত পাত্রে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদপেক্ষা মানসিক শক্তি ও অর্থশক্তির যুগপৎ সদ্ব্যবহার আর কি হইতে পারে? মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রচলনকালে সুদূর মফঃস্বল হইতে তৎকালে এরূপ ব্যাপার যে কিরূপ দুরূহ, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহাদের বাটীতে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার পুঁথি, ন্যায় দর্শনের গ্রন্থ - আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ন্যায়শাস্ত্রান্তর্গত অনুমানখণ্ডের রুচীদত্ত প্রণীত টীকা, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত উপনিষৎ সমূহ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অগণিত প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি দেখিয়া আমরা দিব্য অনুমান করিতে পারি, তাঁহারা মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে কত কত গ্রন্থ সংগৃহীত ও কত কত সুধীমণ্ডলী একত্রিত করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় এবং প্রসঙ্গ ক্রমে সাহিত্য-চর্চ্চায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন।

"মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ" প্রভৃতি বৈষ্ণবকবি বিরচিত পদাবলী, আলঙ্কারিক সূত্রানুযায়ি গ্রথিত সংগ্রহ গ্রন্থ ও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে পদকল্পতরু প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থাপেক্ষা অনেক নূতন বৈষ্ণব কবির নাম সন্নিবেশিত আছে।

পীতাম্বর দে, ভৈরবচন্দ্র চট্টরাজ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতাগণের নাম ও তাঁহাদের রচনা আমরা বহুসংখ্যক সংগৃহীত করিয়াছি।

বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট অভিধানের একান্ত অভাব। মূল পরিষৎ ইহা প্রথমাবধি অনুভব করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক খ্যাতনামা গ্রন্থকার হইতে পরিপোষক কবিতা বা বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত দেশজ শব্দ ও তাহার অর্থ সন্নিবেশিত করিয়া একটি উৎকৃষ্ট শব্দাভিধান সঙ্কলিত হউক, ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই আকাঙ্খার বিষয়। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আজ ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সিউড়ী নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি আদর্শ শব্দাভিধান বহুপরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষার একটি মহৎ অভাব বিদূরিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ মাত্রদুইখণ্ড প্রকাশের পর তাহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি কোন ধনী পুস্তক প্রকাশক কর্ত্তৃক আমরা এইরূপ একটি অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত

হইতে নিরস্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা স্বর্গীয় দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত, কৃতবিদ্য এবং প্রভূত অর্থশালী বঙ্গভাষানুরাগী পুত্রগণকে তাঁহাদের পিতৃদেব কর্ত্তৃক আরব্ধ এই সুমহৎ কার্য্যটি সমাধান করিয়া যুগপৎ পিতৃঋণ এবং বঙ্গবাণীর নিকট মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। দক্ষিণারঞ্জন ই বীরভূমে "দিবাকর" নামক সাপ্তাহিক পত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। আবার তিনিই বীরভূমে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত করেন। "অপূর্ব্ব স্বপ্ন কাব্যে" প্রভৃতি কাব্য এবং বহুসঙ্গীত ও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কীর্ণাহারের সাহিত্যানুরাগী স্বদেশহিতৈষী জমীদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বহুঅর্থব্যয়ে "বীরভূমি" নামক মাসিক পত্র ন্যূনাধিক ছয় বৎসর কাল প্রকাশিত করিয়া বীরভূমে সাহিত্যালোচনার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। "বীরভূমি" পত্রেই চণ্ডীদাস বিরচিত অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং এই চেষ্টার সূত্রাবলম্বনে আমাদের স্নেহশীল সুহৃদ "বীরভূমি"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডীদাসের বিলুপ্ত প্রায় নয়শত পদ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য জগতের রত্নভাণ্ডার অভাবনীয় সম্পৎশালী হইয়া উঠিল। সুতরাং "বীরভূমি" বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিব—

If it has died —it has died a glorious death.

কিন্তু আমরা ভরসা করি, আপনাদের সমবেত চেষ্টায় এবং মঙ্গল ইচ্ছায় ইত পুনরায় নিজ আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রসর হইবে।

সম্প্রতি পরলোকগত দুইজন কবির নাম এইস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম—"পুষ্পাঞ্জলি" প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা সব ডেপুটী কলেক্টর স্বর্গীয় বলরাম দাস গুপ্ত বি,এ। ইনি সংস্কৃত ভাষা হইতে যাবতীয় স্তোত্রমালা ছন্দের অনুবর্ত্তী বঙ্গভাষার কবিতায় যথাযথ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমান কবি স্বর্গীয় আজীজ উস্ সোভান। এই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবির কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার রচিত কবিতা "বীরভূমি"র পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। তিনি সাত আটশত গান, বহু সংখ্যক ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা এবং কালীয়দমন যাত্রার গান ও উপন্যাস রচনা করিয়া অকালে

দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের এই বাল্যবন্ধুর অপূর্ব্ব কবিতাগুলি সময়ান্তরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বন্ধুঋণ পরিশোধের প্রয়াস পাইব। তখন আপনারা দেখিবেন, স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও ভাষা, কবি-প্রতিভার কিরূপভাবে দাসত্ব করিয়া থাকে।

আধুনিককালে বীরভূম প্রবাসী বঙ্গবাণীর সাধক বৃন্দের মধ্যে বঙ্গবাণীর প্রিয়তম সন্তান, ভগবৎসাধনায় সমধিক অগ্রসর, সাহিত্যযোগী কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকবি ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম করিয়া আমরা ধন্য হইতেছি।

এই প্রসঙ্গে "বিশ্বকোষ" নামক অতিকায় বিশ্বাভিধানের প্রবর্ত্তক লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

আমরা প্রবন্ধমুখে প্রাচীনতম এবং সর্ব্ববাদীসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি-যুগলের, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের, যে অপূর্ব্ব মিলনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বীরভূমবাসী যুগে যুগে বঙ্গবাণীর সুসন্তানগণের সেই মঙ্গলময় মিলনের সুখস্পর্শে চিরকাল ধন্য হইয়া আসিতেছে—বর্ত্তমান অবস্থায় যে সে সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত নহে, পরন্তু অধিকতর স্পর্দ্ধান্বিত, অদ্যকার সভায় সমাগত প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক মনিষীগণের উপস্থিতি দ্বারা তাহা যথেষ্টরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

বীরভূমবাসী বর্ত্তমান সহযোগী সাহিত্য-সেবকগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না—সহযোগীগণের গুণকীর্ত্তন করা, আত্মপ্রশংসার নামান্তর বলিয়া মনে করি।

আমাদের অজ্ঞতা নিবন্ধন এবং অনুসন্ধানের অল্প প্রসারতা বশতঃ বীরভূমবাসী পরলোকগত যে সকল কবিবৃন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্বোধন করিতে অসমর্থ হইলাম, তাঁহাদের পবিত্র আত্মার নিকট আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদের বহুসাধনালব্ধ সাহিত্য-সেবার অমৃত উৎস আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে উৎসারিত করিয়া দিন—যে অমৃতের অধিকারী হইয়া আমরা আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ সমর্পণ ও সমগ্র হৃদয় নিঃশেষিত করিয়া মাতৃভাষার চিরপ্রতিষ্ঠা ও অমর-কীর্ত্তি প্রচারকল্পে ব্যয়িত করিতে পারিব। *

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ১০ই আশ্বিন রবিবার

দূরে।

১

মানব হৃদে একি
মায়ার খেলা!
যাহারে কাছে পাই
তাহারে নাহি চাই,
কেবল দূরে ভাল
নিকটে হেলা!
পাপিয়া গৃহদ্বারে
ডাকিয়া কেঁদে মরে,
থামে সে, গেয়ে ধীরে
বিদায়-গান!
সুমুখে ফুলরাশি
দেখিনা তার হাসি,
কেবল দূরে ধায়
আকুল প্রাণ!
আশার ভানুভায়
মোহন সুষমায়,
যে ছবি দূরে জাগে—
নিকটে তার
ক্ষণিক জ্যোতি, হায়,
কোথা' সে মিলে' যায়,
নয়নে রেখে যায়
তৃষার ভার!
দূরেতে শুধু ভাল
নীলিম নদী জল,
তুলিলে, রহে নাক
সে নীল হাসি!
যে মধুমাখা ঠোঁটে
অরুণ ফেটে ওঠে
পরশে টুটে তার
মাধুরী রাশি!

২

অমিয় আছে পাশে
তবুও দেখিনা সে,
মিছে গো দূরে শুধু
খুঁজিয়া মরি!
ব্যাকুল আশা লয়ে,
কেবল দূরে চেয়ে,
অজানা-জ্যোতি পানে
ঝাঁপিয়া পড়ি!
পিপাশা-ঝটিকায়
সে দীপ নিভে যায়;
আলেয়া আলো দূরে
আবার জ্বলে!
পাশে না ফিরে চাই
আবার দূরে ধাই,
সুখের পারিজাত
পিছনে ফেলে!
নিকটে পারাবার
চাতক তবু তার
ভিজেনা ঠোঁট দুটি
মিটেনা আশা।
আকাশ নীলিমায়
তবুও সে যে ধায়
হৃদয় ভরা একি
অসীম তৃষা!

শ্রীসুশীলকুমার দে বি,এ।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান কবি।

বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের সৃষ্টি অল্পকাল পূর্ব্বে হইলেও বাগ্‌দেবীর বীণা বহু-পূর্ব্বেই মধুর সুতানে বাজিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতরব ভাবের প্রবাহে বঙ্গবাসীর হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছিল। অপর দেবদেবীর ন্যায় দেবী বীণাপাণিও সাধনায় তুষ্ট হইয়া থাকেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই তিনি বীণাপাণি, কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহকণা লাভ করিতে হয়। ভক্তের যেরূপ সাধনা, তাঁহার অনুগ্রহের পরিমাণও সেইরূপ, সাধনার গুরুত্বানুযায়ী ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তাঁহার প্রসাদ পরিমিত হইয়া থাকে, যোগ্যতার কণামাত্র অধিক তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার বীণা কোন ভক্তের সাধনায় নির্জ্জীব ও অসাড় জাতিকে নববলে সঞ্জীবিত করে, কাহারও সাধনায় ভগবৎভক্তির অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করে এবং কখনও কখনও বা কোন অধম ভক্তের অসার সাধনায় বিরাগভরে ধিক্কার দিতে থাকে। দেবী বীণাপাণি সর্ব্বদেশেই অতি আগ্রহভরে পূজিতা, কোন দেশেই তাঁহার ভক্তের অভাব নাই।

মুসলমানগণ বঙ্গদেশে বহুকালাবধি বাস করিতেছেন এবং তাহার ফলে বাঙ্গালীর রীতি নীতি আচার ব্যবহার অনেক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীর পূজা করিয়া হিন্দু ভক্তগণ সাহিত্য জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন মুসলমানগণ সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হন নাই কেন? ইহার উত্তরে আমরা কি বলিব যে মুসলমান বাগ্‌দেবীর অনুগ্রহলাভে অসমর্থ? মুসলমান জাতি কি কবিত্ব বিহীন? ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইতে বঞ্চিত? যে জাতি ফেরদৌসি, হাফেজ এবং ওমর খৈয়মের ন্যায় কবি সভ্যজগতকে উপহার দিয়াছে, সে জাতি কখনই কবিত্বশক্তিবিহীন হইতে পারে না। ইউরোপে এমন ভাষা নাই যে ভাষায় হাফেজ ও ওমর খৈয়মের কবিতা অনুবাদ হয় নাই। যেরূপ একদেশের ফল, বোম্বাইএর আম বা কাবুলের দাড়িম্ব, অন্যদেশে রোপণ করিলে তাহার প্রকৃতিদত্ত স্বাদের হ্রাস হয়, সেইরূপ এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাহার মধুরতাও অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। কিন্তু পারস্য-গোলাপ হাফেজ ও ওমর খৈয়ম ইউরোপের সর্ব্বস্থানে রোপিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক শোভা ও সম্পদ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইলেও, আজিও নন্দন কাননের স্বর্গীয় সৌরভে ইউরোপবাসীগণকে প্রফুল্লিত করিতেছে। আপনারা ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব শতক"এ হাফেজের পরিচয় কিয়ৎ-পরিমাণে পাইয়াছেন। ফেরদৌসি ভাষান্তরিত হইয়াছে কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁহারও কবিগৌরব আজিও অক্ষুণ্ণ, কিছু কম সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুলতান মাহমুদের উৎসাহে তিনি যে রণভেরী বাজাইয়াছিলেন তাহা আজিও মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেছে।

মুসলমানগণ বাঙ্গালাভাষায় যে সেরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই তাহার কারণ প্রথমতঃ তাঁহারা বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা করেন নাই। যখন স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের করতলগত, তখন তাঁহারা বিজাতীয়ের সহিত বাস করিয়াও জাতীয় ভাষা ত্যাগ করেন নাই, বিজাতীয় ভাষায় বাক্যালাপে পর্য্যন্ত তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। ভারতের রাজভাষা পারসী, সুতরাং মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইল না। মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজের শুভাগমনেও বহুদিন আদালতের ভাষা পারসীই রহিয়া গেল, সুতরাং এদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা দূর হইল না। সম্প্রতি বাঙ্গালার আদালতসমূহে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইয়া মুসলমানের মধ্যে কিয়ংপরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা হইলেও, এখনও তাঁহারা স্কুল কলেজে সাধারণতঃ পার্সী, উর্দ্দু ভাষাই শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষার রীতিমত আলোচনা না থাকাই মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ না করার প্রধান হেতু বলিয়া অনুমিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া সফল হইবার নিমিত্ত তদ্দেশীয় ভাবের উদ্দীপনা আবশ্যক। কবিত্ব, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে সময় কোন নবভাব জাতি বিশেষের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া প্রবলবেগে আলোড়িত করে, তখনই নূতন কবি শিল্পীরও আবির্ভাব হয় এবং তিনি আপন সূক্ষ্ম তুলিকাদ্বারা সেই জাতীয় ভাব চিত্রফলকে উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত করেন। সাধারণ মানব হৃদয়ের অস্পষ্ট জাতীয়ভাব কবিহৃদয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে কিরণ ছড়াইতে থাকে।

কিন্তু, যেরূপ, অরুণের শতভাগ তেজের একভাগ মাত্র পৃথিবীস্থ সামগ্রীতে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, কবি হৃদয়ে পূর্ণ ভাবের বিকাশ হইলে তিনি তাহার কিয়দংশমাত্র সাধারণ মানবহৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হন। মানবহৃদয়ে যে ভাবরূপ কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠে তাহা লইয়া শিল্পীকবি মালা গাঁথিয়া থাকেন। সাধারণ উদ্যানাধিকারী স্বউদ্যানজাত কুসুমের সুষমা উপলব্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু সুনিপুণ মালাকার যখন তাঁহারই উদ্যানের কুসুমরাজির মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করে, তখন উদ্যানাধিকারী বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাহা উপভোগ করিতে থাকেন এবং তাহা যে তাঁহারই উদ্যানজাত

চক্ষে দেখিতে পাই না দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ও সুনিপুণ কবি চিত্রকর তাহা চিত্রফলকে উজ্জলরূপে প্রতিফলিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করেন।

মহাকাব্য রচনার নিমিত্ত জাতীয় ভাব হইতে মাল মসলা সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তদ্ব্যতীত কবির সফলতালাভের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। এ পর্য্যন্ত যত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, জাতীয় ভাব সকলেরই ভিত্তি-স্বরূপ। জাতীয় ভাবের অভাবে উচ্চ অঙ্গের কাব্যও সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যদি মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট—বাঙ্গালীর জন্ত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইত, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে শেষফল কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে? প্যারেডাইস্ লষ্ট ধর্ম্মভাবমূলক কাব্য, এই জন্তই ইংলণ্ডের নরনারী সাধারণের উপর ইহার এত প্রভাব।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে জাতীয় ভাব অবলম্বন ভিন্ন কোন প্রকার কবিতাই রচিত হইতে পারে না। মানবজাতির সাধারণ হৃদয়ভাব চিত্রিত করিয়াও কেহ কেহ অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কোন কবিই মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হন নাই। কারণ, তাঁহার কবিতা সাধারণ মানবের চর্ম্মভেদ করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না।

সীতার বন গমন বা পাতাল প্রবেশের কথা শুনিয়া এতদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে কেন? কারণ, এই সকল ঘটনা তাঁহাদের জাতীয় উপাখ্যানের অংশ। রাম, সীতা ও লক্ষণ তাঁহাদের ঘরের লোক, সেই জন্তই তাঁহারা উহাদের ব্যথায় ব্যথিত হন। রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান সমূহ বহুকাল পূর্ব্বেই জাতীয় উপাখ্যানে পরিণত হইয়া জাতীয় ভাব গঠিত করিয়া তুলিতেছিল এবং তজ্জন্তই রামায়ণ ও মহাভারতের ভিত্তির উপর এতদ্দেশীয় শিল্পিগণ নব নব সুষমা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা জাতীয় ভাবেরও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

পুরাতন ভাব অপেক্ষা নবভাব প্রবলতররূপে মানব-হৃদয় আক্রান্ত ও আলোড়িত করে। এই ভাবপ্লাবিত দেশে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যখন চৈতন্ত-দেব প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক নবভাবে দেশের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং বৈষ্ণব কবিকুলের সৃষ্টি হইল। বৈষ্ণব-কবিগণ বহু নূতন তরু রোপণ করিয়া বঙ্গীয় কাব্যোদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবে মুসলমান অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই; ইহাই তাঁহার কাব্যে প্রতিষ্ঠা লাভ না করার অন্যতর হেতু। রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান সমূহ হিন্দুর মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু মুসলমানের হৃদয়ে তাহাদের স্থান কোথায়? সাধারণ নরনারীর দুঃখকাহিনীতে মুসলমানের হৃদয় আর্দ্র হইতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ব আরোপে মুসলমানের হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গভাবে পরিণত না হইলেই সুখের কথা। সুতরাং হিন্দুর জাতীয়ভাবশূন্য মুসলমানের হিন্দুর জন্য কবিতা লেখা সম্ভব হইল না।

কিন্তু হিন্দুভাব মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলেও স্বজাতীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত বাঙ্গালাভাষী মুসলমানগণের জন্য এক অদ্ভুত বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিলেন। উর্দ্দু ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত ভাষার কবিতায় মুসলমান লিখিত পুঁথি সমূহের বহুল প্রচার হইল এবং উর্দ্দুভাষা অনভিজ্ঞ মুসলমানগণ সমাদরের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিল। এই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে আজিও ঐ সকল পুস্তকের আদর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং সন্ধ্যাকালে মুসলমান পল্লীতে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসরপ্রাপ্ত মুসলমানগণ "গোলে হরমুজ"এর প্রণয়কাহিনী বা কারবালার যুদ্ধ কাহিনীর ন্যায় কোন উপাখ্যান অতি একাগ্রতাসহকারে শ্রবণ করিতেছে, এবং কখনও নায়কের কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া করতালি দিতেছে এবং কখনও বা তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এই সকল পুঁথির মধ্যে কতকগুলি বাদশাজাদা, দেও ও পরিঘটিত উপন্যাস, কতকগুলি জাতীয় ঐতিহাসিক কাব্য এবং কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক। পুস্তক সাধারণের জন্য লিখিত হয়, সুতরাং সাধারণের রুচি অনুযায়ী পুস্তক রচিত না হইলে সে পুস্তকের স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা কোথায়? বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিবার কাহারও শক্তি থাকিলেও তিনি শক্তি প্রকাশের সুযোগ পাইলেন না। তিনি হিদুভাব বর্জ্জিত; সুতরাং হিদুর জন্য—কবিতা রচনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল এবং মুসলমানের জন্যও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিলে তাহা মুসলমান বুঝিবে না। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান লেখক ও পাঠকগণ এদেশে থাকিয়াও পার্সী ভাষার পরিপুষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন, সুতরাং নব সৃষ্ট উর্দ্দু-বাঙ্গালামিশ্রিত ভাষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা কখনই স্থানপ্রাপ্ত হইল না।

কিন্তু হিন্দুর ভাব ও ভাষা চারিদিক হইতে আসিয়া বারম্বার মুসলমানের হৃদয়ে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইলেও চৈতন্য যুগে যখন প্রেমের প্রবল বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইল তখন তাহা মুসলমানের ঘেরা আঙ্গিনার মধ্যেও প্রবেশ করিল। এদিকে তৎকালেই প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পদাবলীরূপে পরিস্ফুট হইতে লাগিল এবং তাহা গৃহে গৃহে গীত হইয়া মুসলমানকে চলিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিল। এককালেই ভাব ও ভাবপ্রকাশের শক্তি ধীরে ধীরে মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল এবং একে একে মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল ও এই সকল মুসলমান কবি প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সাহিত্য-জগতে বৈষ্ণব কবি নামে খ্যাত, সুতরাং আমরাও তাঁহাদিগকে উক্ত নামেই অভিহিত করিব।

এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্বিবংশতিজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে। পদের শেষে রচয়িতার নাম সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতেই পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া সহজ হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান সমালোচকগণ ইহাঁদের পদাবলী পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

কিন্তু মুসলমানগণ চৈতন্যদেবের সৃষ্ট প্রেমবন্যার দুই এক ঢোক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে উদরস্থ করিয়া তাহাই প্রস্রবণে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না, তাঁহাদের প্রস্রবণ হইতে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হইল। কবি দৌলত কাজি আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে "লোক চন্দ্রিমা" ও কবি আলোয়াল প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে "পদ্মাবতী" ইত্যাদি কাব্যসমূহ রচনা করিলেন। উভয়েই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত।

সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কবি আলোয়ালের কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। উভয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অদ্যকার প্রবন্ধে ইহাঁদের সম্বন্ধে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং অদ্য একটীমাত্র মুসলমান বৈষ্ণব কবির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। এই কবির নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। ইঁহার পদাবলী [illegible]

মৌলবী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহার বিশেষ পরিচয় এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় নাই।

সৈয়দ মর্ত্তুজা রচিত কয়েকটি পদাবলী "পদকল্পতরু" গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সৈয়দ মর্ত্তুজা মুর্সিদাবাদবাসী ফকির বলিয়া পরিচিত। তিনি এবং চট্টগ্রামে সংগৃহীত পদাবলীর রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা জানা যায় নাই। তবে চট্টগ্রামের পদাবলীতেও সৈয়দ মর্ত্তুজা আপনাকে ফকির বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীন ভাষা সংশোধন করিবার কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং আমি ভাষার মৌলিকতা রক্ষা করিয়া তাঁহার পদাবলী উদ্ধৃত করিতেছি।

"পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কর রে॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার।
নবালি যৌবন দিয় খেয়ার পাই পার॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকা কিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি॥"

এই পদটীতে স্পষ্টই রাধা কৃষ্ণ রূপক; ইহা আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। কবি এ স্থলে "পার কর মোরে নাইয়া কানাই" অর্থে "কানাই আমাকে নাইয়া অর্থাৎ ভক্তি রূপ নৌকা দ্বারা ভবসিন্ধু পার কর" ইহাই বুঝাইতেছেন। "ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার।" কানাই ভবসিন্ধু পার-অভিলাষী যাত্রীকে ঘাট নির্দ্দেশ করেন, এই জন্যই "ঘাটের ঘাটিয়াল" এবং ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইলে প্রলোভন হইতে রক্ষা করেন এই জন্যই "পন্থের চৌকিদার।"

"নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার" অর্থাৎ "আমাকে পার কর, আমি তোমার জীবনের সার ভাব নব-যৌবন দান করিব বা আত্মসমর্পণ করিব।"

"হইল হাটের বেলা না হৈল বিকা কিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি।"

মাথার উপরে দিনমণি আইল অর্থাৎ জীবনরূপ দিবসের অর্দ্ধেক গত হইল তত্রাচ ভবহাটে "বিকা কিনি" অর্থাৎ সাধনারূপ কড়ি দ্বারা সিদ্ধিরূপ পণ্যদ্রব্য

সৈয়দ মর্ত্তুজার রূপ বর্ণনায় ভারতচন্দ্রকে মনে পড়িবে।

"সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা॥"

পুনশ্চ—

"কপালে তিলক চান্দ জিনি তারাগণে।
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে॥"

অলঙ্কার ও কবিত্বের হিসাবে উদ্ধৃত পদাংশগুলি অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

কবির হৃদয় ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ। এরূপ হৃদয় কখনই আত্মকৃত সাধনায় তুষ্ট হয় না, তাঁহার প্রেমপিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তাই কবি সাধনার স্বল্পতার বিষয় চিন্তা করিয়া বলিতেছেন :—

"ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীরনদী।
উড়ি যাইতাম সাধ করে পাখা দেয় বিধি॥"

বন্ধুর বাড়ী অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যপ্রাপ্তি হইতে মধ্যে একটা বিঘ্ন আছে সেটা "ক্ষীর নদী" বা প্রলোভনপূর্ণ মায়াময় সংসার। কেবল ভক্তিরূপ পাখা থাকিলে তাহা লঙ্ঘন করা যায়। কারণ "ক্ষীর নদী"তে নামিয়া পার হইবার চেষ্টা করিলে ক্ষীরের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হওয়া সুকঠিন।

কবি রাধিকার মুখ দিয়া বলিতেছেন :—

"আমিত অবলা নারী কিছুত নাহি জানি।
হৃদের অন্তরে আছে প্রেমের আগুণি॥
ধন্বন্তরির পাশে যাই যাহ জিজ্ঞাসিয়া।
তারানি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া॥"

হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের আগুণ জ্বলিতেছে, ঝাড়িয়া নির্বিষ করা সাধারণ ধন্বন্তরির কর্ম্ম নয়। একজন মাত্র মহা-ধন্বন্তরি আছেন, তাঁহার শরণগ্রহণ ভিন্ন উপায় কি?

কবির ঈশ্বরে লীন হইয়া এক হইবার বড় সাধ। তিনি বলিতেছেন :—

ওহে পরাণ বন্ধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার।

কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমার তোমারে দিয়া, তোমার হইয়া রব।”

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীরবে জগৎকে মাতাইয়া থাকেন। কিন্তু সে বাঁশীরব সকলে শুনিতে পায় না, যিনি মহাভাগ্যবান পুরুষ তাঁহারই কর্ণে বাঁশীস্বর যাইয়া প্রবেশ করে। বাঁশীটাত আর কিছুই নয়, বাঁশী শ্রীকৃষ্ণের সার্ব্বজনীন প্রেম, রূপকে কবিগণ বাঁশী নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত ভক্তকবির বাঁশীর উপর অভিমানের উদয় হইয়াছে। বাঁশীর উপর ক্রোধের কারণ—বাঁশীর ডাকে হৃদয় পাগলপারা হয়—তথায় আগুণ জ্বলিতে থাকে। তিনি রাধিকার মুখ দিয়া বলিতেছেন :—

“রাধার আকুল রে বাঁশী না বাজাইয় (ও)।
তরল বাঁশের বাঁশী তাতে পঞ্চবেধা।
বাঁশীয়া কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা॥
যে জাড়ে আছিল বাঁশী জাড়ের লাগ পাম।
জাড়ে মূলে কাটি বাঁশী সাগরে ভাসাম্॥”

কিন্তু কবি বাঁশীর উপর অভিমান প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না। মাঝে মাঝে বাঁশী-বাদকের উপরও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন ; কারণ, তিনি বাঁশীবাদক, বাঁশী বাজাইয়া মন প্রাণ হরণ করেন, কিন্তু সহজে ধরা দিতে চান না। রাধিকা পুনরায় বলিতেছেন :—

“কে বলে কালিয়া ভালা রাই।
কে বলে কালিয়া ভালা,
অন্তরে বাহিরে— কালা,
কালা নহে রস-বিনোদিয়া॥
কি মোর কপালে লেখা,
নয়ানে নয়ানে দেখা,
আখি বাণে জর জর হিয়া॥”

এইবার আমি কবির ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহার রচিত একটী পদে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমতের আভাস পাওয়া যায়। সে পদটী এই :—

"সই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই,
আপে হরে আপে রাখে সখি, মাওলা আপে করে কেলি।
আনন্দ মোহন মাওলা খেলএ ধামালী ॥
আপে মন আপে তন আপে মনহরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুররী ॥"

উদ্ধৃত পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, কবি অতিউদার ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের সার উপলব্ধি করতঃ উভয় ধর্ম্মের মূল মন্ত্র অভিন্ন দেখিয়া মহামতি কবীরের ন্যায় গাহিয়া গিয়াছেন, "যে রাম সেই রহিম।"

আমরাও কবির সহিত সমস্বরে বলি, "যে রাম সেই রহিম।" *

মুন্সী এক্রামদ্দিন।
বীরভূম।

ফুলের ভালবাসা।

১

সোহাগে উঠিল ফুটি
সুকোমল ক্ষুদ্র-প্রাণা
স্নেহের অপরাজিতা
সুখময় নির্জ্জন পুলিনে,
তাপিতা ভানুর করে
দাঁড়ায়ে তটিনী পাশে
নেচে নেচে কাটাইত,—
তটিনী তুষিত সযতনে।

২

তটিনীর কল কল্,
ভ্রমরের গণ্ গণি,
সুশীতল জলকণা,
সুবিমল শ্রান্তিহরা শশী,
নিহারি নিহারি সদা
যৌবন উঠিল মাতি
হৃদে কি বহিল যেন,—
উছলি উঠিল রূপরাশি।

৩

গোপনে আপন প্রাণে
বাড়িয়া উঠিল বালা,
গড়াইল মধুভাব,—
অধীরতা পশিল পরাণে,
আপন গরব ভরে
আপনি সরম পায়
চেয়ে চেয়ে চারিদিক—
চেয়ে রয় আকাশের পানে।

৪

প্রভাতী সমীর শ্বাসে
ঢালিতে সৌরভরাশি
ব্যাকুল হইল বালা—
শিখিবারে ভালবাসা রীতি,
লিখিয়ে সুরভি-লিপি
নিমন্ত্রিল মধুকরে,
যে চাহে ফুলের প্রেম—
কোকিল, ভ্রমর, প্রজাপতি।

---

*"বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয়-মাসিক অধিবেশনে (ভাদ্র, ১৩১৭ সাল) লেখক-

৫

কেহত গো শুনিল না,
কেহত গো বুঝিল না,
মূর্চ্ছাগত ফুলবালা—
প্রাণের পিপাসা রয়ে যায়,
কে করে মধুর আশা,
কে চাহে চপল প্রেম,
নব প্রস্ফুটিত রূপ—
যৌবনের ভার দিবে কায়।

৬

ঝরিল আকাশ হ'তে
স্নিগ্ধ শিশিরের কণা,
ঘুমন্ত নয়ন মেলি,
চকিয়া চাহিল ফুলবালা,
শীতল চুম্বন স্পর্শে
শিহরিল কলেবর,
চাপিয়া ধরিল বুকে—
ক্ষুদ্র-প্রাণা শিশির চপলা।

৭

প্রভাতে রবির করে
পরশি শিশির কণা
মণি সম ঝক্‌ঝকি
জ্বলিয়া উঠিল জলকণা,
আনন্দ উচ্ছাসে মাতি
নেহারে তটিনী বুকে
নব-প্রেম মুঞ্জরিত—
রূপরাশি নিহার-বদনা।

৮

ঝরিল শিশির কণা,
মিশিল তটিনী জলে,
উদাস চাহিল বালা—
ভেঙ্গে গেল সুখের স্বপন।
ভাঙ্গিল স্বপন সহ
ফুলের কোমল কায়,
দেখিতে ছুটিল স্রোতে,
ভালবাসা প্রাণ-বিসর্জ্জন।

৯

বিন্দু ভালবাসা তরে
সাতারি পাথারে বালা
সাগর-সঙ্গম বুকে
ছুটিয়া পড়িল কোন দূরে,
তটিনী সাগর বুকে,
সাগরে মিশিল কণা,
অতলে ডুবিল বালা—
বিন্দুময় অকূল পাথারে।

১০

যেখানে অতল তলে
জ্বলিছে প্রণয়-বাতি
বহিছে রূপের ঢেউ
বসিয়াছে মুকুতার মেলা,
মত্ত ভালবাসা মদে
রূপের ঝলকে আলো
করিয়া সাগর গর্ভ
মুক্তার সাগর-সুরবালা।

১১

বিকল ফুলের প্রাণ,
চাহিল মুকুতা পানে,
বিস্মরি শিশির কণা
যাচিল মুক্তার ভালবাসা,
হাসিল ঘৃণার হাসি
তুচ্ছ ভাবে অবহেলি,
দেখিল না, চাহিল না—
অস্ত গেল ফুলের ভরসা।

১২

সাগর উদ্দেশ করি
চাহিল মুকুতা দল,—
মহান্ সাগর ক্রোড়ে
দেখাইল তাহাদের স্থান,
অগাধে বেসেছি ভাল
অতলে পড়িয়ে রই,
ভাসি না ক্ষণিক সুখে—
নাহি চাই ও হেন পরাণ।

১৩

অসীম সাগর বুকে
ডুবিয়া হারাল কণা,
খুঁজিতে হারাল কুল—
কুলহারা অকুল পাথারে,
ক্ষুদ্র সে কুলের হিয়া,
ক্ষণিক শিশির কণা,
অবোধের ভালবাসা
প্রাণসহ মিটিল আঁধারে।

১৪

ক্ষণিক প্রেমের পিপাসা মিটাতে
ডুবিল খুঁজিতে প্রণয় ধন,
অকুলে পড়িয়ে ডুবিল মিটিল
পিয়াসার সনে পরাণ-ধন।

৺ মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।
বীরভূম।

হাস্যরস।

জীবন-সমুদ্র মন্থন করিলে পর হাস্যরূপ বিচিত্র রসের উদ্ভব হয়। মানুষ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে সময় সময় এই রস পান করে। পশু নয়, বৃক্ষ নয়, ঐ ধূসর ছায়াময় দূর ত্রিকূটের প্রস্তর নয়, এই বিপুল সৃষ্টির মধ্যে শুধু মাত্র মানুষ মানুষের ভাগ্যে হাসির ভোগ বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনেকে বলেন জ্যোৎস্না হাসে। এমন কি, কাননের কুসুমরাশিও নাকি হঠাৎ এক একদিন কবিদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে হাসিয়া খুন হয়! কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল যে এসব মিথ্যা কথা। জ্যোৎস্না হাসেওনা, কাঁদেও না! জ্যোস্না চাঁদের কিরণ। পাঁজি দেখিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আইসে, পৃথিবীর অঙ্গে একটি শুভ্র বৈধব্যবাস জড়াইয়া দেয়, পৃথিবী ঘুমায়। তাতে আবার হাসি কোথায়? যে দেখে সে দুই চক্ষু কাণা। কুসুমের বিকাশ? সেত শিশিরে, কিরণে, কভুবা মৃদু মলয়ানিলে। অন্তরে যে কীটদষ্ট সে আবার হাসিবে! হাসি নাই—হাসি নাই! বিষণ্ণা প্রকৃতি কখনো হাসে না।

তবে, মানুষ হাসে বটে, কেননা না হাসিলে তার জীবন চলেনা, বড়ই দুর্ব্বহ!

খর মধ্যাহ্নে চেয়ে দেখ,—কাঁকরে ভরা প্রান্তর ধূধূ করিতেছে। পিপাসায় জল নাই, সঙ্গে সাথী নাই, জুড়াইবার ছায়া নাই। আঁকিয়া বাঁকিয়া সরু পথটি আবার তাহারি উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাত্রার প্রারম্ভে তাই যদি মানুষ বুঝিতে পারে, তবে একটু না হাসিয়া থাকিতে পারেনা। পথে যেতে যেতে শুকতালু, বোঝা নামাইয়া, হাসির রসে একটু ভিজাইয়া লয়। যখন একবারে চক্ষের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কি করে জানিনা, কিন্তু যতক্ষণ

হাসি জীবন প্রদীপে উস্কাইয়া দিবার পর উজ্জ্বলতর শিখা, বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে বিদ্যুতের স্বর্ণ-প্রভা; ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু চিরদিনের অন্ধকারকে গাঢ়-তর করিয়া দেয়।

তবু চাই, মেঘে বিদ্যুৎ, জীবনে হাসি। কাঁদিলে কি শেষ আছে? কাঁদিয়া শেষ নাই! তাই এক এক সময় মানুষ হাসিয়া বাঁচে। কান্না আট পৌড়ে জিনিষ, হাসি বেচারী নিতান্তই পোষাকী। তাই যখন তখন, যেখানে সেখানে মানুষ তাহাকে বাহির করে না।

যখন সে বাসন মাজে বা কাপড় কাচে, কিংবা আফিসে যায় বা কলম পিশে তখন সে হাসে না। আবার বিরলমধ্যাহ্নে যখন জানালায় মুখ রাখিয়া বসিয়া থাকে, তখন ত মোটেই নয়। কেননা এসব ব্যাপারের একটা স্পষ্ট কারণ আছে; আফিসে যায় মাহিয়ানা পাইবে বলিয়া, জানালায় বসিয়া থাকে সে কাছে নাই বলিয়া। কিন্তু হাসি যে অকারণে!

মানুষ যখন বুঝিতে পারে হাসে না, যখন দুর্বোধ হয় তখন ক্ষণিক স্তব্ধ হইয়া, পরে হাসিয়া উঠে। কি করিবে?

* * * জীবন, উর্ম্মিসংক্ষুব্ধ অশ্রুবন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সে জলের মত তরল সরল, স্রোতের মত একটানা বহিয়া যাইতেছে। তবে হাসে কখন? স্রোতের নীচে গোপন মর্ম্মে অনেক প্রচ্ছন্ন দুঃখরাশি আছে, তাহা কৃষ্ণ প্রস্তরের মত নিশ্চল কঠিন। অশ্রুবন্যা সহসা বেগে তাহার উপর নিপতিত হইলে, কল্ কল্ করিয়া উঠে। বাহিরে আমরা তাহারি প্রতিধ্বনি শুনি—খল্, খল্;—এইত হাসি! যদি হৃদয়তলে দুঃখ জমিয়া পাথর না হইত, তবে মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে হাসিত না।

হাসি, কান্নাকে অতিক্রম করিয়া ছাপাইয়া পড়ে। যে কাঁদেনা সে অচেতন পাষাণ, যে শুধু কাঁদে সে সাধারণ মানুষ, যে হাসে সে বড় মানুষ।

আমি এমন একজন মানুষকে জানি, যে নিয়তই হাসে; আর যখন হাসেনা তখন ঘুমায়। বস্ত্রাঞ্চলে তরুণ দেহবল্লরী আবৃত করিয়া নিঝুম পড়িয়া থাকে, কচিৎ কোমল পাদুখানি দেখা যায়। তাহাকে জাগাইতে যাও—হাসিয়া ফেলিবে! এমনি ঘরকন্নার প্রতি কার্য্য, প্রতি কথা যে হাসির মাধুরীতে সুভূ-ষিত করিয়া তুলে, সে সুন্দর। জীবনে যে তাহার কোন দুঃখই নাই, কেমন করিয়া বলি? কিন্তু একটি সহজ সরল কলহাসি আর সমস্তকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

যখন দুরন্ত ব্যাধির কবলে দেহখানি নিপীড়িত, আড়ষ্ট হইয়া নিশ্চল পড়িয়া আছে, তখনো যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে সে না হাসিয়া উত্তর দিতে পারিবে না। আমার মনে হয় সে যেন একটা হাসির উৎস, আর কিছুই নয়।

মানুষ হাসিবেনাত কি করিবে? সে বেশ করে। সে আনন্দ দেয়, ক্ষমা করে—সে বড় সহজ।

সংসারে কয়জন মানুষ হাসিতে পারে? শুধু মন ভুলান, লোক দেখান হাসি নয়। অন্তরের স্বাভাবিক উৎস, কয়জন হাসির রোলে ছড়াইতে পারে? তাহা যে পারে সে আমার নমস্য;—সে বল দেয়, স্বাস্থ্য দেয়, অবসাদে উদ্দীপনা আনে।

মায়ার সংসার; হাসিয়া যাওয়াই ঠিক্। যদি কাঁদিয়াই জীবন কাটিল, তবেত ভাগ্যেরই জয় হইল। কিন্তু যে বীর হাসিয়া জীবনের অনন্ত দুঃখরাশিকে উপেক্ষা করিল, বলিল "যাও, আমি গ্রাহ্য করিনা"—তারই জিত্।

স্বর্গে নাকি দেবতারা অমৃত পান করেন; তা বেশ! আমরা ক্ষুদ্র মানুষ তাঁহাদের সৌভাগ্য ঈর্ষা করিনা; তবে করযোড়ে প্রার্থনা করি—"ওগো দেবতারা, আমরা যেন একটু হাসিতে পারি—আর কিছুই চাইনা।" এই হাস্যরসে আমাদের পিপাসা মিটিবেনা সত্য,—পৃথিবীর পিপাসা বুঝি মিটিবার নয়,—কিন্তু শুষ্কতালু যেটুকু ভিজিবে তাই যথেষ্ট। আমরা যেন ভবিষ্যৎ মানববংশীয়দিগকে ইহা উত্তরাধীকারীসূত্রে দান করিয়া যাইতে পারি। হাসি অতুল সম্পদ।*

গিরিজাশঙ্কর।

পদ্ম-ফোটা।

প্রভাতের পদ্মটিরে,
হেরিনু সরসী নীরে,
আনন্দ-বিহ্বল,
তখন আকাশ রাঙা,
সিঁদুরের কৌটা ভাঙ্গা,
ছিন্ন মেঘদল।
নীলিম শয়ন তলে,
তল তল স্নিগ্ধ জলে,
হাসি মুখখানি,

আধ' নিদ্রা জাগরণে
ফিরাইয়া আনমনে,
কেন নাহি জানি।
উপরে আকাশ পানে,
চেয়েছিল কি সন্ধানে,
বিস্ময়-মগন,
অঞ্চলে ঝাঁপা'য়ে ধরি',
তারাটিরে বিভাবরী
পলায় তখন।

মনে হয়, ঘুম কার,
ভাঙ্গিয়াছে এইবার,
কৃষ্ণ নিশা শেষে,

গহন আঁধার তলে,
স্বপনের রসাতলে,
গিয়েছিল ভেসে ;—

সেথায় অসুর দল,
হুঙ্কারিছে অবিরল,
মেঘে ও পবনে,

রজনী, তিমির রাণী,
মুখেতে আঁচল টানি,
মুদ্রিত নয়নে ।

সর্ব্বোপরি সিংহাসনে,
ভীষণ ভ্রূকুটি সনে,
ছিল সেথা বসি—

বিভীষিকা-রুদ্ধশ্বাসে,
স্তম্ভিত দারুণ ত্রাসে,
দল যায় খসি' ।

হেনকালে ধীরে ধীরে,
বুলায় কপোলে শিরে,
হিমস্পর্শ কার—

বার বার আঁখি খুলে',
উপরে আকাশে তুলে'
স্পন্দ নাহি আর ।

গত যামিনীর কথা,
স্বপ্নসম দূরগতা,
স্মিত হাসি মুখে,

চেয়ে চেয়ে দেখে দূর,
গোলাপী উষার পুর,
—সরসীর বুকে ।

একি স্বপ্ন-জাগরণ,
একি মায়া আবরণ
খুলিল নিমেষে !—

নবীন আলোক লভি,'
তমিস্রায় পদ্ম কবি
গাহিল আবেশে ।

"কোথায় নবীন উষা
পরেছে বরণ-ভূষা,
বিবাহের বেশ,

কুয়াসা ওড়না খানি,
দিয়াছে আঁখিতে টানি'
ঢাকিয়াছে কেশ ।

উজল নীলিমাকাশ,
শুভশংসী ধূপ-বাস,
ধূসর বাসর ;

কাহার নয়নে জল—
অন্ধকারে অবিরল
তুহিন-নিঝর !

হাতে ধরি' কে তুলেছে,
এতকাল কে ভুলেছে
দাসীরে বধূরে ?

আজিকে দেখিব তারে—
কোন্ বর বিধাতারে,
লগন মধুরে—"

সহসা কুয়াসা সরে,
দেখিল আঁখির পরে
কার প্রেম-মুখ !

চকিতে সরম মাখা
মু'খানি গেল না ঢাকা,
ওষ্ঠে হাসি টুক্ ।

একে একে দলগুলি
শিথিল পড়িল খুলি',
সলিলে ঢলিয়া,

পদ্ম রাঙা হয়ে উঠে,
দুষ্ট' উষা গেছে ছুটে
কখন্ চলিয়া !

প্রভাতের পদ্মটিরে,
হেরিয়া সরসী-নীরে,
আঁখি ছল্‌ছল্—

এ মোর হৃদয়-পদ্ম,
এমনি ফুটিবে সদ্য,
কবে তোরা বল্ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বি, এ ।

সঞ্চয়।

মহাভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

ইউরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে 'এপিক্' কবিতা বলে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সেই প্রকারের যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম ইতিহাস, আখ্যান বা পুরাণ; আর এক শ্রেণীর নাম কাব্য। মহাভারত প্রথম শ্রেণীর এবং রামায়ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃত সাহিত্যের যে যুগ 'ক্লাসিক্যাল' যুগ নামে খ্যাত সেই যুগের কবিতা যে সমস্ত ছন্দে রচিত, এই মহাভারত ও রামায়ণ সেই সমস্ত ছন্দেই রচিত। তবে মহাভারতের ছন্দে প্রাচীনতর যুগের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। উপজাতি ও বংশস্থ বৃত্ত, যাহা বৈদিক ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী ছন্দেরই বিকাশ মাত্র, তাহাতে রচিত অনেক কবিতাই মহাভারতে রহিয়াছে; তাহা ছাড়া গদ্যে রচিত প্রাচীনতর কালের অনেক আখ্যানও মহাভারতে দৃষ্ট হয়। রামায়ণের রচনা হইতে মহাভারতের রচনা পদ্ধতির আরও একটু পার্থক্য আছে। মহাভারতে ছন্দে রচিত কবিতা অংশের প্রারম্ভে অনেক স্থলে "বৃহদশ্ব উবাচ" প্রভৃতি কথা আছে, যাহা কবিতার অন্তর্গত নহে; রামায়ণে এরূপ নাই। মহাভারতে কবিতা অংশের বাহিরে যোজিত এই সমস্ত প্রারম্ভ হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রাচীনকালের উপাখ্যান বিষয়ক গানের (Epic song) মধ্যে মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষার জন্য যে গদ্যাংশ রচনা করা হইত, এ সমস্ত তাহারই চিহ্ন। এতদ্ব্যতীত সমগ্র রামায়ণ প্রধানতঃ একজন কবিরই কীর্ত্তি, ইহার রচনা পদ্ধতি ও আখ্যান কল্পনায় সামঞ্জস্য ও ঐক্য আছে এবং এই গ্রন্থের রচনা স্থান ভারতের পূর্ব্বাংশে। পক্ষান্তরে মহাভারতের কবি ভারতের পশ্চিমার্দ্ধ প্রদেশে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই বিশাল গ্রন্থ অনেক অংশের সমষ্টি। এই সমস্ত অংশের মধ্যে কেবলমাত্র এইটুকু একতা দৃষ্ট হয় যে, তাহারা মূলতঃ বর্ণনীয় মহা ঘটনার সহিত কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট। মহাভারতের সার ঘটনা গ্রন্থের এক পঞ্চমাংশ, এই ঘটনার সহিত বাহিরের এত অধিক বিবিধ বিষয়ক উপকরণ সংযোজিত হইয়াছে যে, এখন এই গ্রন্থখানিকে 'এপিক্' বা মহাকাব্য না বলিয়া, নীতি উপদেশ বিষয়ক এক কোষ-গ্রন্থ বলিলেই সঙ্গত হয়।

বর্ত্তমান মহাভারতে এক লক্ষেরও অধিক শ্লোক আছে। 'ইলিয়াড্' ও 'ওডিসি' এই দুইখানি বৃহৎ মহাকাব্য একত্র করিলে যত বড় হয়, এক মহাভারত একা তাহার প্রায় আট গুণ। বিশ্ব-সাহিত্যে এত বড় কবিতা গ্রন্থ আর নাই। এই গ্রন্থ মহাকাব্যের আখ্যায়িকা, বিবিধ সিদ্ধান্ত ও উপদেশের সমষ্টি—অষ্টাদশ পর্ব্বে ইহা বিভক্ত—তাহার উপর হরিবংশ নামক গ্রন্থ আবার ইহার উনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সমস্ত পর্ব্বগুলি অবশ্য সমান নহে; দ্বাদশ পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দ হাজার; আর সপ্তদশ পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহার শ্লোক সংখ্যা ৩১২। অষ্টম ও শেষের তিনটি পর্ব্ব ব্যতীত মহাভারতের প্রত্যেক পর্ব্বই আবার ক্ষুদ্রতর পর্ব্বে বিভক্ত; প্রত্যেক পর্ব্বে অনেকগুলি করিয়া অধ্যায় আছে।

এ পর্য্যন্ত ইউরোপে সমগ্র মহাভারতের কোনও সংস্করণ হয় নাই। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারীগণকে ভবিষ্যতে ইহা করিতে হইবে। কয়েকজন পণ্ডিতের সমবেত পরিশ্রম ব্যতিরেক এই কার্য্য হইতে পারে না। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস ও বার্লিন নগরে সমগ্র মহাভারতের হস্তলিখিত পুঁথি আছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থলেও সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি যে কত পাওয়া গিয়াছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি হরিবংশ সমেত ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চারি খণ্ডে কলিকাতা হইতে বাহির হয়। এই সংস্করণে টীকা বাহির হয় নাই। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগর হইতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণ তাহার পর অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণে হরি-
——নীলকণ্ঠের টীকা বাহির হইয়াছিল। এই দুই সংস্করণে

বিশেষ কিছু পাঠান্তর নাই। উভয় গ্রন্থেরই পাণ্ডুলিপি এক স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় প্রায়শঃই অনুরূপ। তবে এই দুই সংস্করণের মধ্যে বোম্বাইএর সংস্করণেরই পাঠ ভাল। কলিকাতার সংস্করণ অপেক্ষা ইহাতে ২০০ শ্লোক বেশী আছে। এই শ্লোকাধিক্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে।

মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ তেলেগু অক্ষরে চারি খণ্ডে মান্দ্রাজ নগর হইতে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ইহাতে হরিবংশ ও নীলকণ্ঠের টীকার কোন কোন অংশ আছে। দক্ষিণ-ভারতের পাঠান্তর এই সংস্করণে পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতের পাঠের সহিত উত্তর ভারতের পাঠের অনেক বৈষম্য আছে। রামায়ণের ত্রিবিধ পাঠের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য ইহাও সেইরূপ। উভয় গ্রন্থেরই আকার প্রায় সমান—একটিতে যেমন এক স্থানে কিছু কম, তেমনি অপর স্থানে কিছু বেশী আছে। একটির কোন কোন স্থলের অপেক্ষা অপরটির কোন কোন স্থলের পাঠ উৎকৃষ্ট।

মহাভারতের সার আখ্যায়িকাটুকু কুড়ি হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। শকুন্তলার পুত্র রাজা ভরতের বংশে উৎপন্ন কৌরব-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ও পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই মূল উপাখ্যানের সহিত দেবতা, রাজা ও মুনিদিগের অসংখ্য প্রাচীন উপাখ্যান, সৃষ্টিতত্ব, বিশ্বের বিবরণ, দর্শন, বিধি, ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়জাতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিবিধ সিদ্ধান্ত ইহার সহিত যোজিত হইয়াছে। এই সমস্ত সুদীর্ঘ ও নানা জাতীয় বিচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশ নিবন্ধন উপাখ্যানের সূত্রটুকু অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। কোনও একটি বিশেষ উক্তির সমর্থনের জন্য সময়ে সময়ে এক প্রকাণ্ড উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন উভয় সেনাদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন ভগবদ্গীতা নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এক বৃহৎ দার্শনিক কবিতা পুস্তক যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক বীর অর্জ্জুনের নিকট আবৃত্তি করা হইয়া গেল। এইজন্য মহাভারত কেবল কাব্য নহে—ইহা উপদেশের সারগ্রন্থ—বেদ অনুযায়ী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের উপদেশ ইহাতে আছে; ইহা একখানি স্মৃতিগ্রন্থ, মানবের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হিন্দুদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের আর একটি নাম কার্ষ্ণ বেদ—কৃষ্ণ বিষ্ণুরই রূপান্তর, ইহার বড় বড় বিভাগের প্রারম্ভে নারায়ণ, নর ও সরস্বতীর বন্দনা বিশিষ্ট একটি কবিতা রহিয়াছে—নারায়ণ ও নর বিষ্ণুরই নাম, সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী;—এই গ্রন্থের মধ্যে বিষ্ণু-উপাসনা বিষয়ক উপদেশ অজস্র পরিদৃষ্ট হয়—এই সমস্ত লক্ষণ হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, এই গ্রন্থখানি ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিষ্ণু উপাসক শাখার স্মৃতিগ্রন্থ।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, মহাভারত গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে যে আকারে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহার মেরুদণ্ড স্বরূপে মহাকাব্যের একটি ঘটনা রহিয়াছে, এই গ্রন্থে বিষ্ণু উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা একখানি সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব্বে পরিষ্কার লিখিত হইয়াছে যে, এক সময়ে এই গ্রন্থ চব্বিশ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ ছিল—তখনও উপাখ্যানসমূহ যোজিত হয় নাই—তাহারও পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে এই গ্রন্থে আট হাজার আট শত শ্লোক ছিল; এই গ্রন্থের তিনটি প্রারম্ভ আছে। এই সমস্ত স্বীকৃত বিষয় হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, এই মহাকাব্য একটি নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করার পর পুষ্টি বা বিকাশের তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছে—বাহিরের ও ভিতরের অনেক যুক্তি দ্বারাই এই মত সমর্থিত হয়।

ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই যে, এই মহাকাব্যের যাহা মূল ঘটনা তাহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরু ও পাঞ্চাল নামক দুই জাতির প্রাচীন সংঘর্ষই এই ঐতিহাসিক ভিত্তি; পরিশেষে এই উভয় জাতি এক জাতিতে মিশ্রিত হইয়া যায়। যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দুই জাতি তৎপূর্ব্বেই মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কাঠকে মহাভারতের এক প্রধান ব্যক্তি বিচিত্রবীর্য্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র একজন সুপরিচিত ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং এই মহাভারতের যাহা ঐতিহাসিক বীজ, তাহা বহু দিনের ঘটনা—তাহা

অন্ততঃ পক্ষে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন যুদ্ধ ও এই যুদ্ধের বীরগণের কীর্ত্তি বিষয়ক প্রাচীন গাথা দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছিল, সামাজিক সম্মিলনে, যজ্ঞক্ষেত্রে এই সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত।

আমাদিগকে অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই সমস্ত অসম্বদ্ধ যুদ্ধ-গীতি-সমূহ কোনও প্রতিভাশালী কবি কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এক মহাকাব্যে গ্রথিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা ছিল যে, ধর্ম্ম ও ন্যায় কুরুদিগেরই পক্ষে ছিল, কৃষ্ণের নেতৃত্বাধীন বিজয়ী পাণ্ডুপুত্রগণের বিশ্বাসঘাতকতায় এই কৌরবদিগের দারুণ দুর্দ্দশা সংসাধিত হয়। এই আদিম মহাকাব্য যে যুগের রচনা, সেই যুগের নিদর্শন এখনও মহাভারতে রহিয়াছে। মহাভারতে প্রধানতঃ আমরা যে পরবর্ত্তী যুগের চিত্র পাই, সেই যুগের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী সুদূর প্রাচীনতর যুগের—সে কালের রীতি-পদ্ধতির ও সে কালের বীরভাবের অনেক বর্ণনা এখনও মহাভারতে রহিয়াছে। মহাভারতের অনেক স্থলেই ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রধান রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এই বর্ণনা সেই আদিম প্রাচীন যুগের নিদর্শন। পালি সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বুদ্ধদেবের যখন আবির্ভাব হয়, তাহার পূর্ব্বেই ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বেশ সঙ্গতির সহিত অনুমান করিতে পারি যে, আদি ও প্রাথমিক মহাভারত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা। মহাভারতের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই। এই গ্রন্থে ভারত ও মহাভারত নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেও ইহার রচনা কাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীই নির্দ্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, এই গ্রন্থ গায়কগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া কুড়ি হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ হয়। এই স্তরে, বিজয়ী পাণ্ডুপুত্রদিগের চরিত্র অপেক্ষাকৃত সাধুভাবে চিত্রিত হইল এবং শিব ও বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত তুল্য আসন লাভ করিলেন। এই স্তরে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অবতার রূপে দেখা দিলেন।

আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে অবগত হই যে, প্রায় খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে শিব ও বিষ্ণু বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, অধিবাসীগণ শিব ও বিষ্ণুর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর এক কথা এই যে, মহাভারতে কুরুদিগের পক্ষাবলম্বীরূপে যবন বা গ্রীকদিগের উল্লেখ রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত এই প্রসঙ্গে শক ও পহ্লবদিগেরও উল্লেখ আছে। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ-স্তূপ উভয়েরই বর্ণনা আছে; সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যায় যে, মৌলিক মহাকাব্য খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ, এই সময়ের মধ্যে একটা পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

এই যে প্রাচীন ও লোকমুখে প্রচলিত মহাকাব্য ইহার প্রতিপত্তি যে খুব অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিপত্তির কি প্রকারে সদ্ব্যবহার হইতে পারে, তাহা ব্রাহ্মণেরা বেশ জানিতেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজা ও অন্যান্য লোককে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও উপদেশ অনুসারে চালাইতে চাহেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও উপদেশ মহাভারতে যোজনা করিয়া দিলেন। এই প্রকারে এই গ্রন্থ এক সুবিশাল ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার ধারণ করিল। এই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহের ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি ও অবশ্য পালনীয়ত্ব, জাতিভেদের সনাতন অস্তিত্ব, পুরোহিতদিগের নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। 'ব্যাস'কে যখন মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়, তখন শেষে এই গ্রন্থকে সাজাইয়া যে বর্ত্তমান আকারে আনা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হয়। কারণ ব্যাস শব্দের অর্থ "বিন্যাসকারী।" পণ্ডিত দাহলমান্ এক মত উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ প্রথম হইতেই একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থরূপে হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে—কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু প্রমাণ নাই এবং পণ্ডিতগণও এই মতে শ্রদ্ধান্বিত নহেন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে মহাভারত যে আকারে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, এই আকার এই গ্রন্থ কখন লাভ করিল? কি প্রমাণের সাহায্যেই বা সেই সময় নির্ণীত হইতে পারে? ভূমিদান বিষয়ক এক প্রস্তর ফলক রহিয়াছে—ইহা ৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে খুব জোর ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই প্রস্তর-ফলক অসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, প্রায় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারত

ইহার বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রস্তর-ফলকে মহাভারত লক্ষ শ্লোকাত্মক ও পরাশর নন্দন বেদ-বিভাগকর্ত্তা মহাজ্ঞানী ব্যাস-কর্ত্তৃক গ্রথিত বলিয়া স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাহা হইলে সে সময়ে এই মহাভারতে তাহার সুবৃহৎ পর্ব্বদ্বয়, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এবং তাহার উপসংহার ভাগ অর্থাৎ হরিবংশ যোজিত হইয়াছিল, কারণ ইহাদের মধ্যে কোনটি বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ হইতে অনেক কম পড়িয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত অনেক ভূমিদানলিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ে ধর্ম্মশীল দাতাদিগের পুরস্কার ও পাপিষ্ঠ পরস্বাপহারীদিগের শাস্তি বিষয়ক উক্তি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে মহাভারত যেমন স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া সম্মানিত, পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইহা তদ্রূপ সম্মানিত হইত। বরং এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে, ইহারও এক শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ অনুমান ৩৫০ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ হিন্দুসমাজে এইরূপ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহও তাহাদিগের তারিখযুক্ত চীন দেশীয় অনুবাদ সমূহ আরও আলোচিত হইলে মহাভারতের এই প্রতিপত্তি লাভের কাল আরও কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া যাইবে। এখন আমরা বেশ নিরাপদে ধরিয়া লইতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় অব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই এই মহাকাব্য বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত গ্রন্থের আকার লাভ করিয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে অধ্যাপক হলজ্‌ম্যান (Holtzmann) তাঁহার মহাভারত বিষয়ক গ্রন্থে যে মত দিয়াছেন যে, ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর মহাভারত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং এই সময়ে গোটা গোটা পুস্তক ইহার সহিত যোজনা করা হইয়াছে; আমরা সেই মত বেশ জোর করিয়া উপেক্ষা করিতে পারি।

৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ শতাব্দী কাল এই মহাভারত গ্রন্থের অবস্থা কিরূপ ছিল, আমরা এই সময়ে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইতেছি। বাণ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'সুবন্ধু'র রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, তাঁহারা কেবল যে এই মহাভারত বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের অলঙ্কার স্বরূপে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের প্রত্যেক পর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা হরিবংশের সহিতও পরিচিত ছিলেন। 'বাণ'এর সময়ে ভগবদ্গীতাও যে মহাভারতের অন্তর্ভূত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরে মহাভারত পঠিত হইত। এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই যে মহাভারতের নিয়মিত পাঠ ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের উপনিবেশ সুদূরবর্ত্তী কম্বোজ হইতে প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত এক প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে যে, মহাভারত, রামায়ণ ও এক অজ্ঞাতনামা পুরাণের পুঁথি এই স্থানের মন্দিরে দেওয়া হইয়াছে, এই সমস্ত গ্রন্থ এই মন্দিরে যাহাতে নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়, দাতা তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রমাণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মহাভারত কেবল এক কাব্য নহে, ইহা বহুকাল হইতেই স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এখনও এই সমস্ত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই জানেন।

তাহার পর মীমাংসা দর্শনের প্রচারক কুমারিল ভট্টের কথা আলোচ্য। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ তাঁহার আবির্ভাব কাল। তাঁহার সুবৃহৎ টীকার নাম তন্ত্র-বার্ত্তিক, ইহার অতি সামান্য অংশই পরীক্ষিত হইয়াছে—এই সামান্য অংশের মধ্যেই মহাভারতের অন্যূন দশ পর্ব্বের নাম, তৎসমুদয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ ও তাহাদের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে আদিপর্ব্ব যে আকারে আছে, কুমারিলের সময়েও যে সেই আকারে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, অনুক্রমণিকা, পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ও তখন মহাভারতে ছিল। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও উনবিংশ পর্ব্ব অর্থাৎ হরিবংশ অনেকে পরবর্ত্তীকালের যোজনা বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কুমারিল এগুলির সহিতও পরিচিত ছিলেন। কুমারিলের উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি

এই গ্রন্থকে পরম পবিত্র, অতি প্রাচীনও প্রথম হইতেই চারি বর্ণের শিক্ষার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি এই গ্রন্থ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বর্ণনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; তিনি মনে করিতেন যে, ক্ষত্রিয় জাতির সমর-স্পৃহা জাগ্রত করিবার জন্যই এই যুদ্ধ-বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বেদান্ত-প্রচারক দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য ৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন; তিনি স্মৃতি বলিয়া মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বাদশ পর্ব্বের একটি শ্লোক বিচার করিবার সময় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত লোক বেদ ও বেদান্ত পাঠের অনধিকারী তাহাদেরই শিক্ষার জন্য এই মহাভারত।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমরা মহাভারতের প্রাচীনতম সংক্ষিপ্ত মূর্ত্তি পাই-তেছি। এই গ্রন্থখানির নাম ভারত-মঞ্জরী; কাশ্মীর দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থখানি বড়ই মূল্যবান, কারণ ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে মহাভারত কিরূপ আকারে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক বুলার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সহিত মূল মহাভারত অতি যত্নে তুলনা করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে সময়ে ভারত-মঞ্জরী রচিত হয়, সেই সময়ে প্রচলিত মহাভারতের সহিত এখনকার প্রচলিত মহাভারতের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, তবে একখানি পাণ্ডুলিপির সহিত অপর পাণ্ডুলিপির যেমন সামান্য বিভিন্নতা থাকে, সেইরূপ বিভি-ন্নতা আছে—তাহা কিছু মারাত্মক নহে। ভারতমঞ্জরীও অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত—তবে এখন-কার নবম পর্ব্ব তাহাতে দুই পর্ব্বে বিভাগ করা হইয়াছে, আর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ একত্র করিয়া একটি পর্ব্ব করা হইয়াছে।

এই সময়ে মহাভারত কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার আর একটি উপায় আছে, যাবা দ্বীপে মহাভারতের এক অনুবাদ আছে। ইহাও একাদশ শতাব্দীতে অনূদিত।

নীলকণ্ঠের টীকাই মহাভারতের সুপরিচিত টীকা। মহারাষ্ট্র প্রদেশে গোদাবরীর পশ্চিম তটে কূর্পর নামক স্থানে নীলকণ্ঠ বাস করিতেন। বার্ণেল সাহেবের মতে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। মহাভারতের টীকাকারগণের মধ্যে অর্জ্জুন মিশ্র নীলকণ্ঠ অপেক্ষাও প্রাচীন। নীলকণ্ঠ অর্জ্জুন মিশ্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মহাভারতের এক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে এই উভয় টীকাই ছিল। এখন যে সমস্ত টীকা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; তাঁহার টীকার খণ্ডিত অংশ সংগৃহীত হইয়াছে। ন্যূনকল্পে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ তাঁহার আবির্ভাব কাল। তবে তিনি তদপেক্ষাও প্রাচীনতর কালের লোক হইতে পারেন। *

শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

মুগ্ধা।

সে চাহে আঁখিকোণে, ব্যাকুল সকাতর,
সোহাগে মুখপানে, সলাজ থর থর,
আমি লো মুদি আঁখি লাজেতে, ঢাকি এ মুখ মোর দুহাতে!

---

* Arthur A. Macdonell M. A. Ph. D. কৃত A History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

যদি, উছল বায়ুভরে,
আঁচল খসে' পড়ে,
আমি লো মরি লাজে
চকিতে,
সে হাসে মনে মনে
লাজের আবরণে
পারিনা আপনারে
ঢাকিতে!
তার, পরশ লভি হিয়া
পড়েগো উছলিয়া,
নত এ আঁখি তবু
ওঠেনা!
সে কহে প্রেম কথা
জানায়ে মনোব্যথা,
তবুও কথা মুখে
ফোটেনা!

প্রাণের ভাষা যত,
ব্যাকুল আশা কত,
গোপনে মরে লাজ
বাঁধনে!
শুধু, রুধি এ হৃদি দ্বার
আড়ালে থাকি' তার,
দেখিলো মুখখানি
গোপনে,
তার সে প্রেম আঁখি
লুকায়ে যত দেখি
আবেগ ওঠে তত
পরাণে!
তবুও আপনারে
পারি না দিতে তারে
সঁপি এ লাজ তার
চরণে!

ধর্ম্মের আদর্শ।

সমাজ ও সংসারের সহিত, মানবের বিচিত্র প্রকারের সম্বন্ধ ও সাধনার সহিত, ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সম্বন্ধ কি, তাহা আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। মানব অস্ফুট সচ্চিদানন্দ, তাহাকে প্রস্ফুট হইতে হইবে; সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অন্বেষণই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনা। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, সেই সচ্চিদানন্দ কোথায়? তাঁহাকে কেমন করিয়া ও কোথায় পাওয়া যাইবে?

এক সময়ে আমাদের দেশে ও ইউরোপে মধ্যযুগে এক সম্প্রদায় দার্শনিক ও ধর্ম্মবিৎ ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন যে এই জগৎ, এই মানবমণ্ডলী, মানবের এই বিবিধ প্রকার কার্য্য ও সম্বন্ধ, এ সমস্তের সহিত ভগবানের সম্বন্ধত নাইই, বরঞ্চ এই সমুদয় তাঁহার বিরোধী ও বিপরীত। এই রূপ মতবাদ আশ্রয় করিলে, ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার, ইহলোকের সহিত পরলোকের, সংসারের সহিত ধর্ম্মের

বিরোধ ও বৈষম্য অবশুম্ভাবী। যাঁহারা এই মত অনুসরণ করেন, তাঁহারা সমাজ, সংসার ও যাবতীয় মানবীয় সম্বন্ধ পরিহার করিয়া অরণ্যে অথবা গুহায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা সেই পরমাত্মার জ্যোতি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের উপর ভারতবর্ষে এই মত বিশেষ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দ্বিবিধ প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এই মত আশ্রয় করেন তাঁহারা বলেন যে নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিই গ্রহণীয়, কারণ সগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি প্রথমে আর নির্গুণত্ব প্রতিপাদকগুলি পরে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি দ্বারা সগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের নিষেধ করা হইয়াছে। নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির উদাহরণ এই—

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রম বর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্‌ভূতযোনিং।
পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।১।১।৬

যাঁহাকে দেখা যায় না, যাঁহাকে ধরা যায় না, যাঁহার নাম নাই, যাঁহার বর্ণ নাই, যাঁহার চক্ষু নাই, যাঁহার কর্ণ নাই, যাঁহার হস্ত নাই, যাঁহার পদ নাই, যিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, অবিনাশী, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া জানেন।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১৯

(ব্রহ্ম) অখণ্ড, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ ও জরা মৃত্যু বিহীন) দোষ রহিত এবং কর্ম্ম ফল জনিত সুখ দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট।

এই এক প্রকার ব্রহ্মবাদের কথা বলা বলা হইল, ইহা ছাড়া আর এক প্রকার মত আছে তাঁহারা বলেন এই বিশ্বই ব্রহ্ম এই প্রকৃতিই ব্রহ্ম, এই দৃশ্যমান বিশ্বের বাহিরে তিনি নাই। এই মত হইতে জড়বাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও ইহসর্ব্বস্ববাদ উৎপন্ন হওয়া অতীব স্বাভাবিক হইলেও, এই মতের উপর অনেক প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে, যে দুই মতের কথা বলা হইল, তাহাদের আবার একটা সমন্বয়ও আছে। তিনি বিশ্বে ও আছেন, বিশ্বের বাহিরেও আছেন, বিশ্ব তাঁহাতেই আছে সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বের মধ্যে সমগ্রভাবে নাই। তিনি অসীম লীলার আনন্দের জন্য সসীমের মধ্যে ধরা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার

অসীমত্বের ব্যাঘাত হয় নাই, তিনি সসীমের মধ্যে সসীম হইয়া পড়েন নাই। তিনি এই বিশ্বেও যেমন আছেন, তেমনি আবার নিজের অসীম মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার যেমন স্বরূপ লক্ষণ আছে, তেমনি তটস্থ লক্ষণ ও আছে। তাঁহার এই দুইটি দিকই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদে যেমন তাঁহাকে নিগুর্ণ বলা হইয়াছে তেমনি আবার সগুণ ও বলা হইয়াছে যেমন—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯

যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ।

যঃ সত্যকামঃ সত্য সঙ্কল্পঃ।

যিনি সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প।

যাঁহারা ব্রহ্মের নিগুর্ণত্ব প্রতিপাদন করেন, তাঁহাদের যুক্তি সম্বন্ধে রামানুজ বলেন, যে এই সমস্ত মত বিবিধ কুতর্ক-পরিকল্পিত। যাঁহারা এই মতের প্রবর্ত্তক তাঁহারা উপনিষদুক্ত পরম পুরুষের অনুগ্রহ পাত্র নহেন, তিনি কৃপা করিয়া মানবকে কয়েকটি গুণ প্রদান করেন, এই সমস্ত লোকের সেই গুণ নাই। শ্রুতিবাক্যের পরস্পর বিরোধ নাই, ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলার উদ্দেশ্য এই, যে তিনি সমস্ত হেয় গুণ-বিরহিত, তাঁহাকে সগুণ বলাতে তিনি যে নিখিল কল্যাণ-গুণের আকর, ইহাই বলা হইয়াছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুর্ণ তাহা লইয়া বিরোধ করা অন্যায়। সগুণত্ব ও নিগুর্ণত্ব এতদুভয়ের একটা সমন্বয় রহিয়াছে। এই সমন্বয় উপলব্ধি করিলে মানবের ধর্ম্ম কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা দেখা যাউক।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি পথের মধ্যে বিরোধ প্রাচীন কাল হইতে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই তিনটিই যে তুল্যভাবে এক মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, জ্ঞান ও কর্ম্মবিহীন ভক্তি, অথবা কর্ম্ম ও ভক্তি-বিহীন জ্ঞান, অথবা জ্ঞান ও ভক্তিহীন কর্ম্ম, অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়। জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছা শক্তি কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া নাই। সৎ চিৎ আনন্দ একই অখণ্ড পদার্থ। চৈতন্যের দিক হইতে দেখিলে যাহা সৎ, চিৎ, আনন্দ, জড়ের দিক হইতে দেখিলে তাহাই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যেখানে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অথবা যেখানে এই ত্রিগুণের মধ্যে কোনও একটি নাই তাহা অব্যক্ত, সুতরাং আমাদের আলোচনার অতীত। তবেই দেখা যাইতেছে

যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ই ধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দকে অনুভব করিতে হইবে, ধ্যান, ধারণা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহস্থালীতে, আমাদের জাগতিক নিখিল সম্বন্ধ ও ব্যবহারের মধ্যে,তাঁহার বিজয়-দণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; তাহার পর তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে, অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মরূপে, সমস্ত বহিঃপ্রকৃতিতে পরমাত্মারূপে এবং অনন্তলীলা বা ইতিহাসের মধ্যে ভগবানরূপে উপভোগ করিতে হইবে; তিনি রসস্বরূপ, তাঁহার রসকণা লাভ করিয়া জগৎ আনন্দে অধীর, তাঁহার সেই রস উপভোগ করিতে হইবে, তিনি প্রেম স্বরূপ, তাঁহার সেই প্রেমের স্বাদ লইতে হইবে, সেই প্রেমে স্বয়ং মত্ত ও অধীর হইয়া বিশ্ব মানবের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির যে পথ বলা হইল, এই তিনটি পথ স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে, প্রকৃত সাধক এই তিনটি দিক হইতেই অগ্রসর হইবেন। এই সমন্বয়ের ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্ব হইয়াও বিশ্বের অতীত, সুতরাং বিশ্বজীবনের মধ্যে মিশিয়া বিশ্বনাথের কার্য্যও করিতে হইবে, আবার এই সমস্তের মধ্যে তাঁহার দিকে উন্মুক্ত থাকিতে হইবে; ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধনা।

তাহা হইলে প্রকৃত সাধকের চুপ করিয়া, নেত্র মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই, মানবের দুঃখ দারিদ্র্যের হাহাকার সর্ব্বদা তাঁহার কর্ণে বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে নিনাদিত হইতেছে, তিনি বিনিদ্র ভাবে এই সমস্তের বিরুদ্ধে আপনাকে সর্ব্বদা নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যেখানে দেখিবেন গ্লানি ও দুর্নীতি, যেখানে দেখিবেন মানবের অবিদ্যা ও অস্মিতা, সেই বিশ্বনাথের পূর্ণ জ্যোতিকে আবরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্যত কর, সেই বিশ্বনাথের আহ্বানে, সেই স্থানেই পতিত হইবে। এই যে মানবের সেবা, ইহা প্রশংসা লাভের জন্য নহে; প্রাণের ব্যাকুলতায়, হৃদয়ের একান্ত আগ্রহে। দুঃখীর দুঃখের মধ্যে, পীড়িতের আর্ত্তনাদের মধ্যে, পাপীর পাপের মধ্যে ও বিশ্বনাথের বাঁশরী বাজিতেছে, সেই প্রেমময় সেখান হইতে ব্যাকুলভাবে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, আমাদিগকে হৃদয়ভরা প্রেম লইয়া সেখানে ঢালিয়া দিতে হইবে।

বিশ্বেরও মানবের সেবা ধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ; এই সেবা এক পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবে মানবে যে বিরোধ ও পার্থক্য বিদ্যমান তাহার

বিলোপ সাধনে যাহা সহায়তা করে না, যাহা অনুদারতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডী নির্ম্মাণ করিয়া মানবের চিত্তে অহঙ্কারের বিষবীজ পোষণ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহা ধর্ম্মপদ-বাচ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিশ্বসভ্যতার লক্ষণই এই যে, ইহা বিশ্ব-মানবের একত্ব অনুভব করিতেছে; এক দিন এই মানব জাতির ইতিহাসে ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, অনেক বিরোধ, অনেক রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে, সে মানব জাতির শৈশব সুলভ চপলতা মাত্র। এখন তাহা বিস্মৃত হইতে হইবে। চিত্তকে উদার ও উন্মুক্ত করিতে হইবে, সত্যের আলোক যে দিক হইতেই আসুক না কেন, শ্রদ্ধান্বিত ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

মানুষ যে মানুষ বলিয়াই পবিত্র, মানুষের আত্মাই যে প্রকৃত মানুষ এবং সেই মানবের আত্মাতেই যে ভগবানের পূর্ণতম বিকাশ, এই জ্ঞানটার বিশেষভাবেই অনুশীলন করা দরকার। মানুষের বাহিরের বেশভূষা, আচার আচরণ এ সমস্ত অতি বাহিরের কথা, এ সমস্ত বিষয়ে সকলেরই স্বাধীনতা থাকিবে। অনেক সময়, এ মিলন আবশ্যক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা হইলে ও ইহা ব্যবহারিক মাত্র। যাঁহারা অধ্যাত্ম দৃষ্টি সম্পন্ন, যাঁহারা মানবের এই স্থূল ও নশ্বর দেহকে সেই বিশ্বনাথের, সেই নিত্যানন্দময়ের আসন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা নিজের আত্মায় ও বিশ্ব মানবের আত্মায় সেই পরমাত্মাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই প্রেমময় বিশ্বপ্রাণকে আরও নিবিড়ভাবে, আরও স্পষ্ট ভাবে অনুভব ও উপভোগ করিবার জন্য যাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও হৃদয় বৃত্তি সত্য সত্যই পাগলের মত ব্যাকুল হইয়াছে, সেই সচ্চিদানন্দ সত্যস্বরূপ ও প্রেম স্বরূপকে সমাজে ও সংসারে, আমাদের যাবতীয় সংসারিক সম্বন্ধে, আমাদের প্রেমে, স্নেহে ও বন্ধুতায়, আমাদের আহারে বিহারে ও ব্যবহারে, আমাদের বিষাদে বেদনায়, আশায় আনন্দে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যাঁহার কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার সর্ব্ববিধ চেষ্টার লক্ষ্য সেই সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার বাহিরের অনিত্য বিষয় লইয়া বিরোধ করিবার সময় নাই; আভ্যন্তরীণ ঐক্য, পারমার্থিক সাম্য, তাঁহার মনকে সর্ব্ববিধ বৈষম্য ও বিরোধের ঊর্দ্ধে শাশ্বত মিলন ভূমিতে তুলিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মাদর্শের ইহাই একটা দিক

যাঁহারা জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগকে এই কয়েকটি কথা সর্ব্বদাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। কোনও কার্য্য বা কোনও চিন্তা ধর্ম্মসাধনার অনুকূল কিনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে, এই কার্য্য ও চিন্তা প্রকৃত সমন্বয়ের অভিমুখী কিনা। এক সম্প্রদায়

দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বলেন যে চিন্তার বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, মনে মনে যদ্যপি সর্ব্বদা সাধুচিন্তা করা যায় তাহা হইলেই যথেষ্ট ধর্ম্মসাধনা হইবে, কারণ প্রত্যেক চিন্তাই সূক্ষ্ম জগতে একটা তরঙ্গ জাগরিত করে, এই চিন্তা যতই দৃঢ় ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী হইবে, ইহার শক্তিও ততই বাড়িবে এবং ভবিষ্যতে আপনা হইতেই এই চিন্তা বাস্তব জগতের বা স্থূল জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে একটা শুভ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিবে। কথাটা হয়ত সত্য; আবার অনেকে হয়ত ইহা বিশ্বাসও না করিতে পারেন। এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। একটা কথা খুবই সত্য, যে আমাদের মনের মধ্যে যে সাধু সঙ্কল্পের উদয় হয়, তাহা যথা-সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা চাই। তদ্ব্যতীত সাধু সঙ্কল্প থাকিতে পারে না। কেবল চিন্তা দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার মত আশ্রয় করিলে আলস্যের গৌরব বাড়িয়া যাইবে এবং আমাদের এই কার্য্যসাধক স্থূল দেহ একটা মূল্যহীন ভারমাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ প্রকারের মত যখনই যে দেশে প্রচারিত হইয়াছে, তখনই সেই দেশে লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাব মলিন হইয়াছে।

বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে এই মতের অতীব তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাহার ফলে এই হইয়াছে, যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বৌদ্ধযুগই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। সেই সময়েই ভারতবর্ষে রাজপুত্র, রাজকন্যা দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া নিখিল মানবের সেবার জন্য বাহির হইয়াছেন, রাজরাজেশ্বর ও সন্ন্যাসীর দীনবেশ পরিধান করিয়াছেন, মানবের হিতসাধনই একমাত্র কার্য্য বলিয়া মানব অনুভব করিয়াছে। তেমন দিন জগতের ইতিহাসে আর কখনও কোন দেশের হই-য়াছে কিনা বলা যায় না; আজ যে জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহার কারণ ও আর কিছুই নহে।

চৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।" আমরা যদি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া এই কয়েকটি কথার প্রকৃত অর্থ অবধারণ করি, তাহা হইলে ধর্ম্মের এই উন্নত আদর্শ অতীব পরিস্ফুট আকারে দেখিতে পাইব।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

২। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে।

৩। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৪। যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এজেন্ট শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় গণপুর, ভায়া মল্লারপুর, বীরভূম, এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলে সমস্ত অবগত হইবেন।

শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি-এল্

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ সিউড়ি, বীরভূম।

সূচীপত্র।

[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; পৌষ, ১৩১৭]

THE.

PHILOSOPHY OF BRAHMAISM.

Twelve lectures on Bráhma doctrine, *sádhan* and social ideas, b Sitanath Tattvabhushan, Author of *Hindu Theism*, *The Vedanta an its Relation to Modern Thought* &c. &c. Rs. 2-8. To be had of th author at the Devalay, 210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta.

OPINIONS.

Dr. Hirala Haldar in the *Modern Review.*—This book is a compre hensive treatise on the principles of Theism in which the author ha attempted to show the philosophical basis of these principles It is scholarly work qu te worthy of being placed beside the best philc sophical productions of Europe and America.

Bengali.—It is a comprehensive work, partly philosophical, and partly historical, a lucid presentment of the fundamental principles of a grea movement in modern India.

Indian Witness—It is a book that no serious student of Brahmaism can afford to neglect............It is questionable if there is another Indian in Bengal who has done more in the realm of pure thought than has Pandit Tattvabhushan.

Professor Upton of Oxford.—It is a most able exposition of Brahmaism......I will present it (second copy) in your name to the Manchester College, Oxford, where I feel sure it will be of the greatest service to the students......You can imagine with what warm interest I have read and pondered over your really admirable lectures.

Indian World.—There is a good deal in it which will only perish with modern culture, thought and philosophy .....The one thing which has struck us most in this treatise is the successful attempt of the author to harmonise medern European Philosophy with the Hindu Brahmajnan of thirty centuries ago in a full synthesis.

Indian Review.—A very thoughtful and interesting publication, containing valuable expositions of Hindu philosophy in general ..deserves to be carefully read by every one who has to face the problem of justifying Hinduism (Hindu Theism) to those who are not pledged to believe in its Upanishads and sages.

উপনিষদ্ ।

প্রথম খণ্ড,—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ও মাণ্ডূক্য ।

দ্বিতীয় খণ্ড – শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। সরল টীকা, অবিকল বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও অনুক্রমণিকা সহ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। দুই খণ্ড একত্র কাপড়ে বাঁধান দুই টাকা। প্রথম খণ্ড স্বতন্ত্র এক টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড বার আনা। দেবালয়ে গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

নবপর্য্যায়)

. . . . পৌষ, ১৩১৭ সাল। { য় সংখ্যা।

আশা।

অনন্ত বিকাশের প্রেরণাময়ী প্রাণশক্তি লইয়া, ক্ষুদ্র বীজটি, মাটির নীচে, ন্ধকারের ভিতর, লোক লোচনের অন্তরালে, নিতান্ত অবহেলার মধ্যে, পড়িয়া হইয়াছে। বিশ্ব-শিল্পীর লীলাকৌশল, কি যে সুমহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নসে, তাহাকে তথায় স্থাপন করিয়াছে, তাহা সে নিজেও জানে না, জগত-বী কাহারও তাহা চিন্তা করিবার অবসর আছে বলিয়াও মনে হয় না।

ক্ষুদ্র বীজের হৃদয় মধ্যে অনন্ত আলোকরাজ্যের উৎসবময় মধুর স্বপ্ন জাগি-ছে; দুর্ভেদ্য অন্ধকার, জড়তা ও নিস্তব্ধতা পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার চারিদিক গুলিয়া রহিয়াছে, নড়িবার জো নাই, ঠেলিয়া বাহির হইবার জো নাই, বড়ই ন সমস্যা!

বীজ, অমর প্রাণশক্তির প্রেরণায়, কতপ্রকারের স্বপ্নই দেখিতেছে; ভাবি-ছ, এতবড় জগতের মধ্যে আমি কি এতই ছোট! এমনি করিয়া অজানা র মধ্যে পড়িয়া থাকিব! তাহার প্রাণে যে কত আকাঙ্খা জাগিয়া উঠি-, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না

পার্শ্বে, চারিদিকে, অগণিত শিলাখণ্ড, লোষ্ট্র ও কঙ্কর; তাহারা বাহি
হইতে দেখিতে ঠিক ঐ বীজটির মত, কে বলিবে, এই সমস্ত হইতে বীজ এক
স্বতন্ত্র পদার্থ; এই সমস্ত শিলাখণ্ড, লোষ্ট্র ও কঙ্কর, সেই সর্ব্বব্যাপী অসাড়
ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে, নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া মে
হয়, তাহারা বেশ শান্তিতে, বেশ সুখে, বেশ উদ্বেগশূন্য জীবন যাপন করিতেছে
তাহারা এই ক্ষুদ্র বীজের ব্যাকুলতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছে, বিজ্ঞ
ভাবে নিজেদের বহুদর্শীতার দোহাই দিয়া, তাহাকে নিরস্ত করিতে চে
করিতেছে।

বীজটি কাঁদিতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; কেবল ভাবিতেছে, সে
আলোকরাজ্য কোথায়, সে উদার আকাশের নীচে, উন্মুক্ত বাতাসের মধ্যে
আলো ছায়ার অনন্ত বৈচিত্র্যের রহস্যময় বক্ষের উপর, যেখানে প্রাণের মেল
বসিয়াছে, আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, সে দেশ কোথায়? ইহারা ত কৈ সে
দেশের কথা বলে না, সে দেশের কথা বোঝে না, বলিলে অবাক্ হইয়া শোনে,
কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া চলিয়া যায়?

বীজ ভাবিতেছে, আমার প্রাণে এ আলোকরাজ্যের স্বপ্ন কেন? নিজের
এই ক্ষুদ্রতার ও সসীমতার দুর্গ, সুখসুপ্তির এই দৃঢ় কারাগার ভাঙ্গিয়া, নিজের
বাহিরে ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য, নিজেকে ছড়াইয়া দিবার জন্য, নিজেকে
বিলাইয়া দিবার জন্য, নিজেকে সকলের করিয়া সকলকে নিজের করিবার জন্য,
[illegible] ল পিপাসা কেন? [illegible] পিপাসা কোথা হইতে, কেমন করিয়া আমাকে
আসিয়া আশ্রয় করিল? ইহার অর্থ কি? চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহার
মধ্যে এ পিপাসার, এ অতৃপ্তির, এ [illegible], এ আকাঙ্ক্ষার সূচনাও কৈ দেখিতে
পাইতেছি না? তবে কি ইহা ভ্রান্তি!

একবার ভাবিতেছে, বোধ হয় ইহা ভ্রান্তি। তাই, এ সমস্ত ভুলিয়া, এ চেষ্টা
ছাড়িয়া, চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছে।
কিন্তু ঘুম নাই; সেই আলোকরাজ্যের স্বপ্ন তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না, বিশ্রাম
করিতে দিবে না, সে বড়ই কঠিন তাড়না! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এ
কারাগার ভাঙ্গিতেই হইবে, অজানা দেশের মধ্যে, সেই আলোক রাজ্যের সন্ধানে,
অকূলে ভাসিতেই হইবে। এই আকাঙ্ক্ষা যদি ভ্রান্তিই হয়, মরীচিকাই হয়,

তাহা হইলে ও চেষ্টা করিতে হইবে; বিনাশই যদি ধ্রুব, তাহা হইলে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে বিলীন হওয়া অপেক্ষা, চেষ্টার মধ্যে বিনষ্ট হওয়াই বরণীয়। শুধু তাহাই নহে, এই চেষ্টার মধ্যেই এমন একটা তৃপ্তি আছে, এই অশান্তির উদ্দীপনার মধ্যে এমন একটা শান্তি ও আত্মপ্রসাদ আছে, যে তাহার নিকট জগতের অন্য সকল প্রকারের সুখ ও তৃপ্তি, শান্তি ও আনন্দ লজ্জা পায়, অবসন্ন হয়!

সময় কাটিয়া যাইতেছে, বীজের ব্যাকুলতা ও চেষ্টা বাড়িতেছে। সহসা এক পুণ্যমুহূর্ত্তে, বিশ্বশিল্পীর করুণ আশীর্ব্বাদে সঞ্জীবিত হইয়া, এক বিন্দু স্নিগ্ধ শীতল বারিকণা, চারিদিকের কারাগারসম মৃত্তিকা-স্তূপ ভিজাইয়া, তাহাদিগকে সরস করিয়া, স্নেহে সেই বীজের মুখচুম্বন করিল; আনন্দে পুলকিত হইয়া বীজ শিহরিয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ যে স্নেই স্বপ্নরাজ্যের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে! চারিদিকের প্রতিবন্ধককে শত্রু বলিয়াই জানিত, আজ দেখিল তাহাদেরই বুকের মধ্যে তাহার পুষ্টি ও বিকাশের উপকরণ লুকাইয়া ছিল, বৃষ্টিবিন্দু ভিজাইয়া, সরস করিয়া, তাহাদের বুকের অন্তরতম স্থল হইতে বাহির করিয়া, বীজকে তাহা দান করিল। বীজ বুঝিল তাহারা শত্রু নহে, পরম মিত্র।

একটির পর একটি করিয়া বৃষ্টি বিন্দু আসিতেছে; সরস মৃত্তিকার নিকট পাথেয় পাইয়া, বৃষ্টি বিন্দুর নিকট পথের সন্ধান পাইয়া, প্রাণশক্তি অঙ্কুরিত হইল, সদয় হৃদয়ে মৃত্তিকা পথ ছাড়িয়া দিল, স্নেহের সহিত বলিয়া দিল এখন হইতে চিরদিন তাহারা নিজেদের বুক চিরিয়া, প্রাণের সারভাগ, তাহাকে পাথেয়স্বরূপে প্রদান করিবে। কারণ, সে এখন তীর্থযাত্রী, তাহার স্পর্শে তাহার সংসর্গে মৃত্তিকা আজ আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে, তাহার পদসেবার অধিকার, মৃত্তিকার নিকট আজ পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শুভক্ষণে, শুভলগ্নে, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোকরাজ্যের মধ্যে অঙ্কুর উঁকি মারিল। নূতন চেতনার মধ্যে তাহার পুনর্জন্ম হইল। স্বপ্ন সফল হইল, পুলকে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

তাহার পর কতদিন গিয়াছে। কত বর্ষার বারিধারা অজস্রধারে মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছে; কত মলয় সমীরণ, কত প্রভাতের সূর্য্যকর, কত পৌর্ণমাসীর রজত উচ্ছ্বাস, কত প্রভাত সন্ধ্যার বিহগকাকলীর সহিত ক্রীড়া

করিতে করিতে, আজ বীজটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত; কত পথিক ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে, কত ক্ষুধিত সুরসাল ফলে জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে, কত সন্তপ্ত কুসুম-গন্ধে আপ্যায়িত।

আজ যাহারা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে, যাহারা ফলভোগে লাভবান, যাহারা কুসুমগন্ধে তৃপ্ত,—মৃত্তিকানিহিত অন্ধকারাগারে বদ্ধ বীজটির অতীত ইতিহাস কি তাহারা স্মরণ করিবে না? আজ, বর্ত্তমানে, যে সমস্ত বীজ এই প্রকারে বিধাতার আশীর্ব্বাদ-বিন্দুর অপেক্ষায়, আলোকরাজ্যের সুখ স্বপ্নে বিব্রত, আজ কি কেহ তাহাদের সন্ধান লইবে না? সার্থকতার পশ্চাতে যে নিরাশার তমস্বিনী, অবজ্ঞার ও প্রতিবন্ধকতার ভীষণ কারাগার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কথা কি কেহ ভাবিবে না?

আজ দ্বিতীয় মাসের "বীরভূমি"র উপকরণগুলি হস্তে লইয়া এই কথাই বার বার মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, সেই শীতল আশিসবিন্দু স্বর্গ হইতে নামিয়া আসুক, প্রতিবন্ধকের নীরব স্তূপ সরস হইয়া উঠুক, আমরা পুষ্টির পাথেয় ও পথের সন্ধান পাইয়া, সেই আলোকরাজ্যের উৎসব ক্ষেত্রে পুলকে অঙ্কুরিত হইয়া উঠি।

"স্বর্গ।"

হে নাথ, দিন মোর
অবসান!
সাঁঝের মেঘরাশি
ছেয়েছে দশ দিশি,
থেমেছে কোলাহল
হাসি গান!
পিছনে দিনশেষে
অতীত নিভে আসে,
সমুখে অজ্ঞাত
পারাবার,

বিপুল কালোজল
ভীষণ থল থল,
আঁধার ঘিরে আসে
চারি ধার!
প্রবল বায়ুবেগে
লহরী ওঠে জেগে,
ভেলাটি বুঝি মোর
ডুবে হায়!
না না না, ওকি দূরে
সোণার মেঘ থরে
ওকি ও জ্যোতি রেখা
দেখা যায়!

চলেছে দিক্ ছেয়ে
কালের স্রোত বেয়ে,
তাহার মাঝে ওকি
ঝল্মল্!
কথার 'পরে কথা,
ব্যাথার 'পরে ব্যথা,
ঢেউর 'পরে ঢেউ
ছল্ ছল্,
হৃদয়ে ব্যাকুলতা,
কোথায় তীর কোথা ?
অধীর সংশয়
টুটে প্রাণ।
তাহার মাঝে একি
জ্যোতির রেখা দেখি,
বুঝি এ দুঃখের
অবসান!
নিরখি' ও আলোক
নিভিছে সব শোক,
জগতে মিছে সব
মিছে সব!
মিছে ও ছুটাছুটি
কথার কাটা কাটি
মিছে ও হাসিগান
কলরব!
কাহার মিটে তৃষা ?
কাহার মিটে আশা ?
সুখ সে মরীচিকা
ক্ষণতর!

ব্যথার' পরে ব্যথা,
কথার' পরে কথা
আঁধার গাঢ়তর
গাঢ়তর!
যেথায় হতে ভাসি,
সেথায় ফিরে আসি'
জীবন চক্রের
এ নিয়ম।
নয়ন নাহি ভরে,
হৃদয় নাহি পুরে,
মায়ার বিক্ষেপ
কি বিষম!
হেনাথ, দয়া করে,
ডাকিয়া লও মোরে,
অসীম পারাবার
পথহীন!
ও আলো জ্বলে দূরে
জানিনা কোন্ পুরে
সেথায় কোন্ দেশ
স্বনবীন!
শুধু এ হিয়া মোর
কি যেন স্নেহ ডোর
অবশ করি' টেনে'
লয়ে যায়!
জগৎ ডাকে মোরে
"আয়রে আয় ফিরে!"
অতীত, কত মধু
গীতি গায়

আবার মায়া ফেঁদে
বুঝিবা রাখে বেঁধে
হে নাথ, ছিঁড়ে দাও
সব ফাঁস !
উচ্ছ্বাসে প্রচ্ছ্বাসে
দেহত টুটে আসে,
তবুও টুটে না এ
মায়া পাশ !
ঝড় ত গেছে নেমে
তুফান নাহি থামে,
সুখত গেছে, আছে
সুখ আশা !

হে নাথ, দয়া করে
দাওগো দাও ছিঁড়ে
মায়ার বন্ধন
সব ফাঁস !
অতীত অনাগত
জড়িত স্মৃতি শত
আসুক হিয়া ভরি'
সেই গান,
যে গান শুনি' চির
উছাসে কি অধীর
আকুল ভক্তের
সারা প্রাণ।
হে নাথ, দিন মোর
অবসান !

"মর্ত্ত্য।"

এমন সুন্দর
ধরণী !

যেথায় ফুল ফুটে
যেথায় মেঘ ছুটে
যেথায় বহে মৃদু
তটিনী !

মানব সুন্দর
মুগ্ধ-অন্তর
অমৃত নির্ঝর
হৃদয়ে !

এমন ধরা হতে,
কে, নাথ, চাহে যেতে
কোথায় কোন দূর
নিলয়ে !
থাক্‌না কুটিলতা
থাক্‌না দুখ ব্যথা
পিপাসা সংশয়
যাতনা !
এ শোভা, এই আলো,
বড় যে বাসি ভালো
হেথায় প্রেম আশা
সাধনা !

মেঘ সে কদিনের ?
শরত হাসে ফের
আলোক আঁধারের
খেলা এ !
আশায় নিরাশায়
জগৎ চলে যায়
তাহারি মাঝে সুখ
মিলায়ে !
চাঁদ সে ডোবে উঠে'
ফুল সে ঝরে ফুটে,
পিপাসা রেখে যায়
নয়নে,—
এ তৃষা, চপলতা
এইত সুখ হেথা,
তৃপ্তি নহে সুখ
ভুবনে
পাপের, পুণ্যের,
সুখের, দুঃখের,
দিবস রাত্রের,
নিয়মে
চলেছে চরাচর
চেতন জীব জড়
কে জানে কোন্‌দুর
অসীমে !
থাক এ অবিরাম
পিপাসা, সংগ্রাম,
জয় সে পরাজয়,—
যাতনা !

এ শোভা এই আলো
যা আছে সেই ভালো,
হে নাথ আর কিছু
চাহিনা !
তোমার হাসি লেগে,
হৃদয়ে উঠে জেগে'
হাসির ঊষা চির-
অরুণা !
জীবন-পলে-পলে
ভাসি যে আঁখি জলে,—
হে নাথ, সেও তব
করুণা !
হেথার ফুল হাস
সকল সুখ আশ,
হৃদয় ভরা প্রেম
মধু গো,
এ যদি মিছে সব
বিফল কলরব
মায়ার বিভ্রম
শুধু গো,
চাহিনা মুক্তির
অসীম সুখ চির,—
মায়ার বন্ধন
মিঠে যে !
এধরা স্নেহ নীরে
অমিয় নির্ঝরে
সকল আশা তৃষা
মিটে যে

ব্যথার ফাঁসে ফাঁসে,
সুখের আশ্বাসে,
স্নেহের কত দৃঢ়
বাঁধুনী
হে মোর চির সুখ!
হে মোর চির দুখ!
হে মোর সুন্দর
ধরণী!
সুদিনে দুর্দ্দিনে
কেটেছে তোর সনে,
স্নেহের বন্ধনে
কত রে!
সোণার রবি আলো
মেঘ সে কালো কালো
স্মৃতির ছায়া শত
শতরে!

আজি এ বন্ধন
হে মোর পুরাতন!
বুঝিগো চিরতরে
ঘুচিবে!
তবুও দেহ খান
—থাকনা যেথা প্রাণ!
মাটিতে তোরি সাথে
মিশিবে,
যেথায় ফুল ফুটে
যেথায় মেঘ ছুটে
যেথায় বহে মৃদু
তটিনী।
হে মোর সুন্দর
ধরণী!

শ্রীসুশীলকুমার দে বি,এ,

উজ্জ্বল চন্দ্রিকা।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই হউক, আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অনুদ্দিষ্ট ভাবেই হউক, যিনিই আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান গতিবিধি পর্য্যাবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষা এখন আর দীনা বা সঙ্কুচিতা নহে—পরন্তু, ভাব-গৌরবে সমধিক গৌরবান্বিতা, বিবিধ বৈভবে সমলঙ্কৃতা এবং জগতের ভাষা-রাজ্যের বিরাট সভায় আর্য্য বধূচিত রাজবেশে সমাসীনা হইবার জন্ত নিত্য অগ্রগামিনী।

ব্যক্তিগত অক্ষমতার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু, যাঁহারা শক্তিশালী ভাগ্যবান পুরুষ—যাঁহাদের হৃদয়ে ভাবলহরী উত্থিত হইলে তৎপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না—হৃদয়ের ভাব ও মুখের ভাষা, পরস্পর অধীন হইয়া কার্য্য

করিতে থাকে—তাঁহাদের রচনাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের বঙ্গভাষা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, জটিল হইতে জটিলতর ভাবনিচয় অবাধে সরলভাবে সুষ্ঠু ও সমীচীন ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থা।

এরূপ ভাষা অল্প দিনে গঠিত হইতে পারে না। সাগরগর্ভে কোন দিন একটি নূতন দ্বীপের আবির্ভাব দেখিয়া, আমরা ভাবিয়া দেখিনা যে, ইহা হঠাৎ বা ক্ষণিক কোনরূপ উত্তেজনার ফল নহে—কত সহস্র, কত অযুত বর্ষ ধরিয়া কোটি কোটি অগণিত প্রবালকীট, নিজ নিজ দেহপাত করিয়া, এই দ্বীপগঠনের সহায়তা করিয়াছে—কত কত ভূ-কম্পাদি আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া তাহার পরিপুষ্টি করিয়াছে, তবে সে অনন্ত-বিসারি নীলাম্বু সাগরগর্ভে ক্ষীণরেখার ন্যায় জাগরিত হইয়া ক্রমে দ্বীপরূপে পরিণত এবং মানবগণের বাস-যোগ্য হইয়া উঠে। আমাদের বঙ্গভাষাও তদ্রূপ লোকলোচনের অন্তরালে কত মনীষীর দীর্ঘ-দিবস যামিনী ও দীর্ঘ জীবনের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা এবং কত শত রাষ্ট্রবিপ্লব, কতশত ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবাদি দ্বারা ক্রম-পরিপুষ্ট হইয়া জগৎ সমক্ষে মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থা হইয়াছে।

বসতি করিবার পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, যেমন এই নবগঠিত দ্বীপের মৃত্তিকাস্তর পরীক্ষা করিয়া ইহার উপাদানাদির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ এই বঙ্গভাষার, গগন-চুম্বী বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ভিত্তি-পরীক্ষাচ্ছলে ইহার গঠন, উপাদান এবং গঠনকারীগণের সম্যক্ পরিচয় সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধ, শাক্ত এবং অন্যান্য লৌকিক ধর্ম্মাবলম্বিগণের দ্বারা বঙ্গভাষা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট হইলেও একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, বৈষ্ণব কবিগণই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টি ও প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এবং সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব গোস্বামী ব্যতীত আমরা অপর কোন বৈষ্ণব বা খ্যাতনামা কবির নাম বা রচনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হই না। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুণ্য-প্রভাবে—তাঁহার দেশ-প্লাবী প্রেম-বন্যার সুখশীতল কোমল স্পর্শে যে কত কত সাধুচরিত মহামনা মনীষী যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব সম্পৎ-শালী করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

নরনারী হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাবরাজির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া গীতি কবিতার রচনার জন্য, বঙ্গভাষা যে আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারে সমর্থা হইয়াছে, ইহার মূলে সেই প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বজনীন প্রেম প্রণোদিত বৈষ্ণব কবিগণ। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে, ইহাঁরা অধিকাংশ স্থানই অধিকার করিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব-মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিতেছেন।

চরিত-শাখা, কাব্য শাখা, সন্দর্ভশাখা—সাহিত্যের যে কোন বিভাগেই হউক না কেন, বৈষ্ণব কবিগণ চিরকাল সমকক্ষবিহীন। তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের কবিত্ব, তাঁহাদের প্রেম, তাঁহাদের ভাব,—তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবন হইতে পৃথক ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও আয়োজন, ভগবানের সঙ্গলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতায় অনুপ্রাণিত ভাব, প্রেম ও কবিত্ব দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সুতরাং, তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেম নিঃসৃত অপূর্ব্ব ভাষায় যে আন্তরিকতা, যে সূক্ষ্মদর্শিতা, যে সৌন্দর্য্যানুভব ক্ষমতা—সর্ব্বোপরি, প্রকাশিত বা প্রচ্ছন্নভাবে যে পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ।

বৈষ্ণব কবিগণ যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শিব ও যাহা কিছু সুন্দর তাহারই পর্য্যালোচনা করিয়া ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইতেন। আমরা অদ্য তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভব ক্ষমতার নিদর্শন লইয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী বা খণ্ড-কবিতা পাঠ করিয়া তন্ময়-চিত্ত না হয়, এরূপ মানব বিরল -তাঁহারা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় এতই সৌন্দর্য্য ও এতই অমৃত-রসের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে, আমরা পাঠকবর্গকে বর্ত্তমান যুগের অসাধারণ প্রতিভাশালী গীতি-কবির, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৈষ্ণব কবিতা" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই কবিতায় বৈষ্ণব কবিগণ 'সৌন্দর্য্যের দস্যু' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বাস্তবিকই, তাঁহারা জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিয়া নানা ছন্দ ও নানা উচ্ছ্বাসে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও গীত মধ্যে যথাযোগ্যভাবে সন্নিবেশিত করিয়া আমাদিগকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিগণ, ভগবানকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বশক্তিমান রূপে দেখিতেন না—তাঁহারা ভগবানকে প্রিয়জনের ন্যায় দেখিতেন। তাই,

'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

(বৈষ্ণব কবিতা)

বৈষ্ণব কবিগণ তাই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উপাসক। তাঁহাদের এই মধুর ভাব, ভগবানের সহিত এই আত্মীয়তা ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহাদের রচিত পদাবলী বা গীতিনিচয়ে স্পষ্টতমরূপে প্রকাশমান।

বৈষ্ণব পদাবলী, ভগবানের নিকট তৃষিত ও তাপিত প্রাণের আত্ম নিবেদন। বৈষ্ণব পদাবলী ভগবদ্ভক্তের প্রেমোচ্ছ্বাস-জনিত গণ্ডবাহী অশ্রুধারা। বৈষ্ণব পদাবলী নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভক্তজনের ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার ঐকান্তিক অভিলাষ বা ভগবৎ-সঙ্গতির অনুভব। আবার বৈষ্ণব পদাবলী, পাপী তাপীরও পাপ প্রবৃত্তি ও পাপানুষ্ঠান হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইবার আশা, আকাঙ্খা ও চেষ্টা।*

ভগবানের সঙ্গ-লিপ্সা, ভগবানের বিশ্বব্যাপী সত্ত্বার স্বরূপ জ্ঞান, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রবর্ত্তক, উত্তেজনা ও জীবনব্যাপী সাধনা। অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে এই সঙ্গ-লিপ্সার উৎপত্তি এবং ক্রম-পরিপুষ্ট হইয়া পদাবলীরূপে ইহার বহির্বিকাশ।

ব্যাকুল হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা, যখন নির্জ্জনে মৌনভক্তের গণ্ডস্থলে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তখন আর তাহার স্ফুটতর কোনরূপ স্থায়ী নিদর্শন বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু যখন ইহা ভগবদ্ভক্তের মুখে পরিব্যক্ত হয়, হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাস, বাগ্ধারায় অভিব্যক্ত হয়—তখন ইহা কবিতা, গান বা গদ্য-রচনায় সাহিত্য মধ্যে চির-নিবদ্ধ রহিয়া যায়।

---

* এইটি এবং পরবর্ত্তী কয়টি 'প্যারা', দেবালয় পত্রে (১ম বর্ষ) প্রকাশিত মল্লিখিত পদাবলী সাহিত্যে প্রার্থনা শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে—লেখক।

প্রত্যেক কোমল-হৃদয় মানব, নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি স্বরূপ এই সকল ভক্তবাণী আলোচনা করিয়া তাপিত প্রাণে সুখ-শীতল শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলী, সাধারণ মানব আচরিত প্রেম-চেষ্টার নিষ্ফল বিবৃতি নহে। ইহা সাধারণ নায়ক নায়িকার পরস্পর সঙ্গ-লাভের প্রবল ব্যাকুলতার ন্যায় ভক্ত-চিত্তের ভগবৎ সঙ্গ লাভের কঠোর চেষ্টা। এই স্থূল কথাটি সর্ব্বদা মনোমধ্যে স্মরণ রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, বৈষ্ণব পদাবলী সাধক, ভক্ত বা কবির দশা-পর্য্যায় বা অধিকার ভেদে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—প্রথম "প্রবর্ত্ত দশা", দ্বিতীয় "সাধক দশা", তৃতীয় "সিদ্ধ দশা।"

'প্রবর্ত্ত দশা' বা 'ক্রিয়ারম্ভে' মানব-হৃদয়ে কেবলমাত্র ভগবৎসত্বার অনুভূতির অস্পষ্ট সঞ্চার ও তাঁহার সঙ্গলাভের প্রবৃত্তির উন্মেষমাত্র হয়। তখন মানব, সঙ্গ-লিপ্সার অদম্য তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠে।

'সাধক দশা' বা 'ক্রিয়া-সাধন' অবস্থায় ভক্ত-হৃদয়ে প্রথম জোয়ারের নিদারুণ বেগ সংযত হইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত-ভাব ধারণ করে। ভক্ত, তখন ভগবৎ সঙ্গলাভের উপায় লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তৎসাধনে প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হইতে যত্নপর হন।

এই দুই অবস্থা বা 'দশা' উত্তীর্ণ হইয়া ভক্ত যে দশায় উপনীত হন, তাহার নাম 'সিদ্ধদশা' বা 'সেবা অভিলাষ'। এখন ভক্ত হৃদয়ে সাধনাবস্থার প্রথম যৌবনের সে উদ্দাম বেগ নাই, প্রৌঢ়ের সে ক্রিয়াকাণ্ড নাই,—এখন তাঁহার বার্দ্ধক্যে গত জীবনের উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত ধন উপভোগ করিবার অভিলাষ—এখন ভগবৎ-সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার সেবা অধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্খা।

সাধকের এই তিন দশা বা পর্য্যায়, বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে 'স্থায়ী-ভাব' অন্তর্গত যথাক্রমে "সাধারণী রতি", "সমঞ্জসা রতি", ও "সমর্থা রতি" এই তিন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ভগবানের প্রার্থনা বা সাধন-কার্য্যে যিনি যত অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই ভগবানের সান্নিধ্য এবং সখ্য লাভ করিবেন। তখন তিনি,

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'।

এই তন্ময়ভাব লাভ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবেন। ভগবান তখন

তাঁহার নিকট একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সখারূপে প্রতীয়মান হইবেন, তখন ভগবানের প্রতি আর আশঙ্কা বা সঙ্কোচের ভাব রহিবে না, তখন ভক্ত ভগবানের মুখে বলাইবেন,

'দেহি পদপল্লব মুদারম্' *

তখন ভক্ত, শ্রীরাধিকার

'নিদ যায় চাঁদ-বদন শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা' †

দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইবেন না !

এইরূপে ভক্ত সাধক ভগবানের প্রতি সাধারণ মানবীয় ভাব আরোপ করিয়া যথাক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, এবং ক্রমে এই সমুদয় পরিপুষ্ট হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় "চরমাবস্থা" বা "মহাভাব" অনুভব দ্বারা স্বর্গীয় বিমল আনন্দ লাভ করিয়া মানব জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করেন।

ভাষা যাহাতে অসংযত ভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বিপথগামী না হয়, তজ্জন্য যেমন ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসন আছে, তদ্রূপ এই পদাবলী সাহিত্যের রচয়িতাগণ, যাহাতে ভ্রমে পতিত না হন, যাহাতে তাঁহারা ইহার অপব্যবহার না করেন, তজ্জন্য বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ বিধান আছে। সুতরাং, পদাবলী সাহিত্য সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইলে বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ভরত মুনি এই আলঙ্কারিকগণের মধ্যে আদি কবি বলিয়া স্বীকৃত। তদনন্তর বৈষ্ণব গোস্বামীপাদগণ এই অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অলঙ্কার গ্রন্থের মধ্যে অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচয়িতা পরম ভাগবত শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রণীত "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" এবং "উজ্জ্বল নীলমণি" এই দুইখানি গ্রন্থই প্রধান। এই উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

"ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম বা পূর্ব্ব বিভাগে—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয় বা দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব, ব্যাভিচারীভাব ও স্থায়ীভাব প্রভৃতি নির্ণয়; তৃতীয় বা পশ্চিম বিভাগে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর

* বীরভূমবাসী জয়দেব গোস্বামী।

† বীরভূমবাসী জ্ঞানদাস।

রসাদির ভাব নির্ণয় ও তাহার উপভোগ এবং চতুর্থ বা উত্তর বিভাগে—গৌণরস ও মুখ্য রস বিচার; মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদির নির্ণয় এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য রসভাবাদির বিচার বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ, আমাদের অদ্যকার আলোচ্য "উজ্জ্বল নীলমণি," গোস্বামী পাদ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন,

মুখ্য রসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেনোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতেঽত্র মধুরঃ॥

অর্থাৎ—"ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্য রসের বর্ণন সময়ে অতিশয়গূঢ় প্রযুক্ত মধুর রস অতি সংক্ষিপ্তরূপে উক্ত হইয়াছে; 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে পৃথকরূপে বিস্তার করিয়া মধুরাখ্য ভক্তিরস-রাজ বর্ণিত হইতেছে।" সুতরাং এই গ্রন্থখানি, প্রথমোক্ত "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" নামক গ্রন্থের উপসংহার বা উত্তর বিভাগ।

"উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থখানি, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—(১) নায়ক ভেদ প্রকরণ, (২) নায়ক সহায় প্রকরণ (৩) হরি-প্রিয়া প্রকরণ, (৪) বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণ, (৫) নায়িকা ভেদ প্রকরণ, (৬) যূথেশ্বরী ভেদ প্রকরণ, (৭) দূতী প্রকরণ, (৮) হরিবল্লভা প্রকরণ, (৯) উদ্দীপনা ভাব বিবৃতি, (১০) অনুভাব বিবৃতি, (১১) সাত্বিক ভাব বিবৃতি, (১২) ব্যভিচারীভাব বিবৃতি, (১৪) স্থায়ীভাব বিবৃতি. (১৪) শৃঙ্গার ভেদ বিবৃতি এবং (১৫) সম্ভোগ প্রকরণ।

গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে গ্রন্থকার এই গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ীভাব নির্ণয়, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিবৃতি প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের সূত্র এবং তৎসমুদয় পরিস্ফুট করিবার জন্য বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক প্রত্যেক শ্লোকের পরিপোষক সংস্কৃত পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানিকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

গোস্বামী পাদ শ্রীলজীবগোস্বামী এই গ্রন্থের "লোচন রোচনী" নাম্নী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "আনন্দ চন্দ্রিকা" নাম্নী টীকা রচনা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ উভয়বিধ টীকা

বঙ্গানুবাদসহ প্রচারিত হইলেও গ্রন্থ দুর্ম্মূল্যতা এবং বিষয়ের দুরূহতা বশতঃ এতদিন জনসাধারণের অনধিগম্য ছিল।

আমরা বহুদিন অবধি এই উপাদেয় গ্রন্থের একখানি মূলানুযায়ী সরল অনুবাদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলাম। তবে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিয়া মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, এমন সুন্দর অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থের কোন না কোন কবি নিশ্চয় অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ আ [illegible] ব পূরণ করিয়া গিয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিলেই হইল! আমাদের অনুমান বৃথা হয় নাই—আমরা এইরূপ গ্রন্থ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি। সেই গ্রন্থখানি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থ—"উজ্জ্বল চন্দ্রিকা"।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে লুপলাইন মধ্যে গুস্করা ষ্টেসনের নিকট চানক গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যনিধি মহাশয়, চানকের সন্নিকট নাখুরিয়া গ্রাম নিবাসী, বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাসদ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভব নবকিশোর দত্তের কনিষ্ঠভ্রাতা হরিদত্তের আদেশে 'আনন্দ সহকারে ১৭০৭শক বা ১৭৮৫খ্রীঃ অব্দে পৌষ মাসের ১০ই তারিখ রবিবারে, এই গ্রন্থ রচনা সমাধা করেন। এই হরি দত্তের পৌত্র মাধবিন্দ দত্তের ভাগিনেয় বাতিকার নিবাসী জমিদার অধুনা পরলোকগত ৺ মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট আমরা এই গ্রন্থের একটী প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই—সেই প্রতিলিপি হইতে আমরা এক প্রস্থ নকল করিয়া লইয়াছি। এই গ্রন্থখানি যে আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত। সম্প্রতি "বীরভূম সাহিত্য,পরিষৎ" হইতে এই গ্রন্থ মূল সংস্কৃতসহ মুদিত হইতেছে অচিরে পরিষদের সদস্যগণ মধ্যে বিতরিত এবং সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। তখন আপনারা এই সমগ্র গ্রন্থের রসাস্বাদ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল "উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থ ও তাহার টীকা দুয়ের সমন্বয় করিয়া ভাষা কবিতায় তাহা "স্পষ্টীকৃত" করিয়াছেন। তিনি শেষে লিখিয়াছেন—ইতি

শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিতোজ্জ্বলমণি স্পষ্টব্যাখ্যা সমাপ্তা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ে, টীকাসম্বন্ধে মূল গ্রন্থের কিরূপ যথাযথ সরল ভাষায়

পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা আপনারা অল্পদিন মধ্যেই দেখিতে পাইবেন। অদ্য এইস্থলে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের পরস্পরের প্রতি ভাবোদ্দীপনের গুণ, নাম, চরিত, ভূষণ, গান, সম্বন্ধী ও তটস্থ এই কয়টি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই গুণাবলী কায়িক, বাচিক ও মানস এই তিনভাগে বিভক্ত। "কায়িক" আবার বয়ঃসন্ধি, (নব্য ব্যক্ত ও পূর্ণ), রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপ ও মার্দ্দব্য এই কয় ভাগে বিভক্ত। এই প্রসঙ্গে "রূপ" সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত।
রূপ বলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত॥

তদ্দৃষ্টান্ত যথা,—

রাইক অলকা চিকুর বিলাসে। কস্তুরী পত্রক কমল বিলাসে॥
রাইক চঞ্চল নয়ন তরঙ্গ। শ্রুতি যুগ কুবলয় দ্যুতি কর ভঙ্গ॥
ও মুখ মৃদু মৃদু হাস পরচার। যাহে বিফল যেন রতন কি হার॥
সুন্দর রাইক অঙ্গ কি মাঝ। আভরণ গণ সব পাওল লাজ॥

"লাবণ্য"—

মুক্তা জিনি অঙ্গকান্তি করে ঝল মল।
তাহারে লাবণ্য কহে রসিক সকল॥

তদ্দৃষ্টান্ত যথা—

শ্রুতিমূলে এক, বচন কহি সুন্দরী তুহ তাহে কর অবধান।
কাহে অধোবদন, হোই তুহ বৈঠলি, অসময়ে বিরচলি মান॥
দেখ হুরি হৃদয়, উপরি ইহ বিলসই, তু নহে আন কেহ নারী॥
নিরমল দরপন, সদৃশ হরি রঙ্কসি ও প্রতিবিম্ব তোহারি॥

"সৌন্দর্য্য"—

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেই সুষ্ঠু সন্নিবেশ।
কবিগণ কহে তারে সৌন্দর্য্য বিশেষ॥ যথা,

মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র, বিম্ব জিনি কুচদ্বন্দ, ভুজ দুই আনত কন্ধর।
মধ্য মুষ্টি পরিমিত, শ্রোণী অতি বিস্তারিত, উরু দুই অতি গুরুতর।
রাই, তোর রূপ ভুবনের সার।
কিবা এই তনুখানি, কোমল নবনী জিনি উপমা দিবারে নাহি আর।

'অভিরূপতা"—

যাহার নিকটে রহে আর বস্তুগণ।
অভিরূপ গুণে হয় তাহা বিবরণ॥ যথা—

কৃষ্ণের দশনে বসি, স্ফটিক হইল বাঁশী, হাতে হয় পদ্মরাগ মণি।
গণ্ডের নিকটে জেঞা, ইন্দ্র নীলমণি হঞা, বাঁশী হ'ল রতনের খণি।

'মাধুর্য্য—"

অনির্ব্বচনীয় রূপ জগতের ধূর্য্য।
কবিগণ তাহারেই কহেন মাধুর্য্য॥ যথা—

কিরূপ দেখিলাম আমি রবি সুতা কূলে। বরণী না হয় রূপ মন রৈল ভুলে॥
আঁখি ঠারে কুলবতীর ব্রত কৈল নাশ। এমন মাধুর্য্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ॥

"অনুভাব বিবৃতি" অধ্যায় হইতে অলঙ্কার বিষয়ক কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

অনুভাব হয় তাথে তিন প্রকার।
অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, বাচিক নাম আর॥

এই অলঙ্কার বিংশতি প্রকার। যথা, "অঙ্গজ"—ভাব, হাব, হেলা এই তিন প্রকার, "অযত্নজ" শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য* ও ধৈর্য্য এই সপ্ত প্রকার এবং "স্বভাবজ"—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, ও বিকৃতি এই দশ প্রকার।

'ভাব'—

প্রথম রতিতে হয় ভাব নাম তার।
নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম বিকার॥

কখন তোমার, নয়ন কমল চঞ্চল নাহিক দেখি।
কানু বনমাঝে, বিহার করিছে, দেখিছ পশারি আঁখি॥
আয়ত নয়ান, চঞ্চল হইয়া, শ্রবণ নিকটে গেল।
যাহার শোভাতে শ্রুতির কুমুদ, ইন্দীবর সম হল॥

'হাব'—

ঈষৎ প্রকাশ নাম হাব নাম ধরে।
গ্রীবা বক্র ভুরুনেত্র বিকশিত করে॥ যথা—

তোমার যুগল নেত্র, হইয়াছে অর্দ্ধ মুত্র, ভুরুলতা করিছে নর্ত্তন।
মনেতে জানিলাম আমি, মাধব দেখেছ তুমি, তেই হয় এত ভাবোদ্গম॥

* এটি ঔদার্য্য কি ঔদাত্ত এই লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। সম্পাদক।

'শোভা'—

রূপের সৌভাগ্য হয় অঙ্গ বিভূষণ।
রস শাস্ত্রে শোভা বলি কহে কবিগণ॥

যথা, সুবল প্রতি কৃষ্ণ বাক্য,

রম্ভতুলা অঙ্গুলে, ধরি কদম্বের ডালে, কুঞ্জ ছাড়ি বিশাখা আইল।
দুই আঁখি ঢুলুঢুল, এলায়্যা পড়েছে চুল, সেই রূপ মনেতে রহিল॥

"দীপ্তি"—

বয়োদেশ কাল গুণে কান্তির বিস্তার।
অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হলে দীপ্তি নাম তার।

চাঁদের কিরণমালা, বিপিন করেছে আলা, সুগন্ধি পবন বহে মন্দ।
রাই অঙ্গ ঝলমল, ঝুরে গেছে শ্রম জল, অতিশয় শোভে মুখচন্দ্র॥
দেখ রাই নিকুঞ্জ ভিতরে।
অলস তরঙ্গ অঙ্গে, বসি আছে শ্যাম সঙ্গে, সৌন্দর্য্য কানুর মন হরে

'মাধুর্য্য'—

সর্ব্ব অবস্থাতে যে চেষ্টার চারুতা।
রস শাস্ত্রে হয়ত মাধুর্য্য বলি প্রথা॥

দক্ষিণ কর হরি কন্ধে, আর ভুজ শ্রোণী বন্ধে, দুই পদ ছন্দ প্রায় দেখি।
অল্প মুখনত করি, রসারম্ভে ফিরি ফিরি, কিবা শোভা করে শশীমুখী

'ঔদার্য্য'—

সর্ব্ব অবস্থাতে যেই করয়ে নিলয়।
ঔদার্য্য বলিয়া তারে রস শাস্ত্রে কয়॥

সরল নয়ন গতি, বদনে করয়ে স্তুতি, দেখি করে সম্ভ্রম অপার।
তাথে করি অনুমান, [illegible]দয়ে রাধার নাম, বিদগ্ধের এই ব্যবহার॥

'ধৈর্য্য'—

চিত্তের উন্নতি যে[illegible] স্থিরতর হয়।
ধৈর্য্য বলিয়া তা[illegible] কবিগণ কয়॥ যথা—

কঠিন অন্তর করি, আমারে ছাড়িল হরি, আনন্দ করয়ু বহুতরে।
আমি তার সেই প্রেমে, না ছাড়িব জন্মে জন্মে, এই আশা মোর মনে করে।

'বিচ্ছিত্তি'—

অল্প ভূষণে যার বড় কান্তি হয়।
বিচ্ছিত্তি বলিয়া তারে রস-শাস্ত্রে কয়॥　যথা—

একটি মাকন্দ পত্র পরিয়াছে কাণে।
তাহাতে পরম শোভা রাধার বদনে॥
রক্তবর্ণ সেই পত্র হৈল আভরণ।
তাহাতেই বশ হৈল গোবিন্দের মন॥

'ললিত'—

ভঙ্গি রঙ্গি মনোহর ভুরুর বিলাস।
ললিত বলিয়া রস শাস্ত্রে পরকাশ॥

বৃন্দাবনে লতা যত,　ফুল ফলে বিকশিত,　ভ্রূভঙ্গিতে তার পানে চায়।।
ওপদ পঙ্কজে রাজে,　চলি যায় বনমাঝে,　অঙ্গ গন্ধে মধুকর ধায়॥
মুখ পদ্মে অলি ধায়,　করপদ্মে বারে তায়,　এই মত বনে চলি যায়।
যেন বৃন্দাবন দ্যুতি,　হয়া স্বয়ং মূর্ত্তি মতী,　তরুলতা দেখিয়া বেড়ায়॥

'চকিত'

ভয়-হেতু না থাকিলে যেই হয় ভয়।
চকিত বলিয়া তারে রস-শাস্ত্রে কয়॥

ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর,　এই দুষ্ট মধুকর,　উড়ি বৈসে আমার বদনে।
এই বাক্য কহি রাধা,　জেন প্রকাশিল বাধা,　আলিঙ্গয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ভক্তের স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় এই কয়টি 'সাত্ত্বিক ভাবে'র পরিচায়ক।এই ভাব নিচয়ের আবার উপবিভাগ আছে। এই স্থলে সাত্ত্বিক ভাব বিবৃতি অধ্যায় হইতে কয়েকটি উদাহরণ সংগৃহীত হইল—

রাধিকার দেহলতা,　চন্দ্রকান্ত বিরাজিতা,　বুঝিলাম তাহার অন্তর।
চন্দের উদয় হেরি,　তারা রহে নৃত্য করি,　স্বেদ ছলে গলে কলেবর॥

'স্বেদ' (ভয় হেতু)—

ভয় ছাড় কলাবতী,　দূরেতে তোমার পতি,　এই বন নিবিড় গহন।
অনেক যতন করি,　দিলাম অলকা সারি,　ঘর্ম্ম জলে হয় বিনাশন॥

'স্বেদ' (ক্রোধ হেতু)—

কৃষ্ণের ধ্বনিত শুনি,　মনে ক্রোধ কৈল ধনি,　লজ্জা করি কিছু না কহিল।
স্বেদ জল পড়ে গায়,　বসন ভিজিল তায়,　মনের ক্রোধ তাহাতে জানিল

'ব্যভিচারী' ভাব অধ্যায়ে কবি 'স্মৃতি' বিষয়ে বলিতেছেন—

সাদৃশ্যের দরশন আর দৃঢ়াভ্যাস।
ইহাতেই হয় চিত্তে স্মৃতির প্রকাশ॥

'সাদৃশ্য দর্শনে' স্মৃতি যথা,—

পুলিন্দ নারীগণ, গোবিন্দের স্মরণ, করেছে তমাল দরশনে।
কৃষ্ণভাব তরঙ্গে, খেদ হইয়াছে অঙ্গে, অতি দুঃখী হইয়াছে মনে॥
হংস, আমার বচন তুমি ধর।
যমুনার মাঝে জেঞা, নিজ পাখা ডুবাইয়া তাহাদের অঙ্গে বায় কর।

'উপমা'—

যথা কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যতা যাহাতে রহয়।
উপমা বলিয়া তারে কবিগণ কয়॥

নব-জলধর দ্যুতি, বড়ই মধুর মূর্ত্তি, এই নট করিয়াছে বেশে।
ধরিয়াছে আর রূপ, সেই যুবা অপরূপ, তোমরা দেখেছ কোন দেশে॥

যথা বা—

কৃষ্ণ তুল্য মেঘ লেখা, ইন্দ্র ধনু শিখিপাখা, বিদ্যুৎ হয়েছে পীতাম্বর।
সে মেঘ দেখিয়া ধনি নয়নে বহিছে পানি ভাবে অঙ্গ হৈল স্থিরতর।

"স্থায়ী ভাব" অধ্যায়ে ইহার ক্রমবিকাশ এই রূপ বর্ণিত আছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, ও মহাভাব। এই গুলি আবার সাধারণী রতি, সমঞ্জসারতি ও সমর্থারতি এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাধারণী রতির সীমা প্রেম পর্য্যন্ত, ইহার দৃষ্টান্ত কুব্জা ইত্যাদি ; সমঞ্জসা রতির সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত—ইহার দৃষ্টান্ত রুক্মিণী ইত্যাদি ; সমর্থা রতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্ত ব্রজদেবীগণ ও শ্রীমতী রাধিকা। এই অধ্যায় হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

'প্রেম'—

ধ্বংসের কারণে যার না হয় ধ্বংসন।
প্রেম হয় সেই দোহার ভাবের বন্ধন॥

তোমারি শপথ মোরে, আমি করি ধর্ম্মাচারে
তাথে মোর নাহি কিছু শেষ।
কত কুবচন বলি, আমি তারে দিএ গালি
তুমি মোরে মিছা কর রোষ॥

সখি, বড়ই নিঠুর পরাণ তার।
পথ আগলিয়া রহে,　　আমি কি করিব তাহে,
গৃহপতি করু প্রতিকার॥

এই প্রেম ত্রিবিধ—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। এই গুলি আবার কৃষ্ণ বিষয়ক গোপী বিষয়ক এই দুই ভাগে বিভক্ত।

'স্নেহ'—

প্রেমের পরম কাষ্ঠা জ্ঞানোদ্দীপন।
হৃদয় দ্রবায় স্নেহ কহে কবিগণ॥
এই স্নেহ উদয় করয়ে যার মনে।
তার আশা নাহি পুরে কৃষ্ণ দরশনে॥

কৃষ্ণের বদন বিধু,　　তাহার কেবল সিধু,　　তাহে রাধা নয়ন চকোর।
পুনঃ পুনঃ পান করে,　　তভু নাহি ছাড়ে তারে　　সীধু পানে হইয়াছে ভোর॥
অদভুত লাগিল দেখিয়া।
পেট ভরি সুধা খাএ,　　অশ্রু ছলে উগারয়ে　　তভু পীয়ে,উন্মত্ত হইয়া॥

সেই স্নেহ হয় পুনঃ দুইত প্রকার।
ঘৃত এক নাম হয় মধু নাম আর॥
অত্যন্ত আদর যাথে সেই হয় ঘৃত।
এই মত কহে রস শাস্ত্রের পণ্ডিত॥

'মান'—

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ॥ যথা—

তোমার সুরভি বায়,　　পথে ধুলি উড়ে তায়,　　সেই ধুলি নয়নে লাগিল।
তাথে মোর আখি ঝুরে　　মুখানিলে কিবা করে,　　ইহা বলে ভুরু বাঁকাইল॥

'প্রণয়'—

মানের বিশ্বাস হলে হয়ত প্রণয়।
এই মত রস শাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

'রাগ'—

প্রণয় উৎকর্ষে দুঃখ সুখ সম হয়।
রাগ বলি রস শাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

রাগ'—

সদা তুষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হয়্যা অনুরাগ পুনঃ॥

ভাব'—

অনুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত।
যাদবাশ্রয় বৃত্তি ভাব হয়ত বিদিত॥

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। গ্রন্থের উপসংহারে কবি বলিতেছেন,

অতুল্য অপার সেই মধুর রস সিন্ধু।
তটস্থ হইয়া পাইনু তার এক বিন্দু॥
তাহা কিছু স্পষ্ট করি করিনু বিস্তার।
নিঃশেষে বর্ণন করে হেন শক্তিকার॥
শ্রীরূপ গূঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল।
তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল।
এই রসে যেই জন রসিক হইবে।
পরম আদর করে ইহারে জানিবে॥
নির্ব্বুদ্ধির হাতে না করিহ সমর্পণ।
একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন॥

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা গ্রন্থকারের শেষ অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি নাই।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।†

(অনুবাদ)

শয্যা।

ফুল শয্যা, সুখ শয্যা ভেবে থাক যদি
ভ্রান্তচিত,—মায়াজালে হয়েছ জড়িত;
সুখের শয়ন সেই—যে শয়নে রহি
প্রাণবায়ু চিরতরে হয় বহির্গত।

বন্ধন।

থাকে সাধ যদি বান্ধিবার তরে
সুদৃঢ় বন্ধনে অপরের হিয়া
রজ্জু-প্রান্ত তবে ভ্রমণে শয়নে
আপন হৃদয়ে রাখিও বান্ধিয়া।

---

* "বীরভূম সাহিত্য পরিষদের" প্রথমবর্ষ তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (২১শে ভাদ্র, ১৩১৭) পঠিত।

† এই দুইটি Walter Savage Landorএর রচনা হইতে গৃহীত।

বঁধুয়া রহল পরবাসী

১

উড়ত বিহঙ্গম গাও সুতানে
বিজন-গহন বন
প্রান্তর কানন
উড়ি উড়ি গাও।
অবলাক দুখ বাতাও।

২

গুঁজরি গুঁজরি তুহু উড় মধুপায়ী
গুণ গুণ গুঞ্জন
গাও অনুখন
দুখ হামারি
যাও, যাঁহ গেয়া মনহারী।

৩

কহত ভ্রমর তুহু বাত দোচারি,
তুহু পর ধাওলি
রাহা না বাতাওলি
যৌবন সামহারী
বা বঁধু! পরাণ তোহারি।

৪

ময়ূর ময়ূরী তুহু দোঁহে মিলি যাও,
সৌরভ লুটি লুটি
বনে বনে ছুটি ছুটি
সমীরণ ধাও
কৃতান্ত কাল জানাও।

৫

যাও কোকিল তুহু কুহু কুহু গাও,
রকত নয়ন দুহু
ডাকত হু হু
কান্দি কান্দাও—
জীবনক পন্থ সুধাও।

৬

কাল বিসরি বঁধু কত দিন গেল,
সময় নিকট ভেল
এই সম আওল
দরশ না দেল—
বরষ বরষ বিতি গেল।

৭

ধরত বিহগ তুহু এই পতিহারি,
সুখ শরীরে রহে
তুহু যদি না কহে
বাত বিচারি—
অতিথে লুটাওব যোবন হামারি

৮

শরত শরত আজি ভেইল কতকাল,
এই শরত দিনে
দেবতাক পূজনে
শ্যাম নাহি আল
ঠাট পুরাতন ভেল।

৯	১০
কোন বাঁধব তবে সুখ বাতাওয়ে	অভাগী জনম হাম রহিনু উপাসী
বিনা বারি সিঞ্চন	ঋতু সুখ কারণ
ফুটল কুসুম	শীতল সমীরণ
অলি না সুধাওয়ে—	বহল উদাসী—
মুঁজরি, পবনে ঢলি যাওয়ে।	বঁধুয়া রহল পরবাসী।

৺ মহম্মদ আজীজউস্ সোভান।
বীরভূম।

"দেখা হইল না বলিয়া"।—

অমাবস্যার রাত্রি, বাহিরে, বড় দুর্যোগ। পৃথিবীর ধূলিতে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন। অন্ধকার—মেঘ—বিদ্যুৎ! জানালার ফাঁকদিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বায়ুর মৃদু গম্ভীর নিনাদ। কি করা যায়? স্তব্ধ হইয়া বসিলাম। ঝড় যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। সঘন জলদ গর্জ্জন। প্রকৃতির এই উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যে আমার কি আসে যায়? যায় বৈ-কি, নইলে এমন আড়ষ্টভাবে বসিয়া পড়িলাম কেন? বুকের তলে পুঞ্জে পুঞ্জে এমন আবেশের মেঘ কোথা হইতে আসিয়া জমিল! বাহিরের ঝড়, অন্তরের মানুষ, কি সম্পর্ক?

তা'যাক্; আমি এই নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া ক্ষণিক চিন্তা করিব। কি চিন্তা? কেন, এই যে অগণ্য জ্যোতিষ্ক সাথে শূন্য পথে ভ্রাম্যমান আমাদের এই নগণ্য, অথচ কমলালেবুর মত উত্তরে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা পৃথিবী, ইহাকে ওগো ঝড়ের দেবতা, কে তুমি দোলা দিতেছ? এই কম্পন,—এই অনন্ত কলরোল,—তার মাঝে শান্ত হইয়া বসিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—কথা কও। * * কেবল সোঁ-সোঁ, যেন কোন অকূল হইতে বহিয়া আসিতেছে;—সোঁ-সোঁ! তবে যাও। যে একটু দাঁড়াইবেনা তার সঙ্গে কে কথা কয়!

আচ্ছা, 'বড়ই দুঃখ করিতেছে' এমন একজন মানুষকে যদি আমি ভেবে ফেলি, এমন ঝড়ের সময়, তাতে দোষ কি? দুঃখীর জন্য চিন্তাইত সকল চিন্তার সার। এইত ভগবান বুদ্ধদেব গয়ার একটী বটবৃক্ষের নীচে বসিয়াই একক্রমে

ছয় বৎসর কত মতে কত চিন্তা করিলেন,—দুঃখী মানুষের জন্যই না? রাজত্ব সংসার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ছিন্ন কন্থা পড়িয়া রাজার দুলাল পাথারে কান্তারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অশোক সে পুণ্য কাহিনী পাথরে খুদিয়া দেশের বুকে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। আহা, তাই আজ দেশ ধন্য।

তবে যে বড়ই দুঃখ করিতেছে তার জন্য নিরাপদে এই বিজন কক্ষে বসিয়া যদিই বা একটু চিন্তা করি, তাতে দোষ কি? ঝড়ের গতি ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।

দুঃখ করিতেছে—বড়ই দুঃখ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! একজন মানুষ দুঃখে নিপতিত, আর একজন তার জন্য স্থিরভাবে বসিয়া চিন্তা করিবে? না— তা কখনই নয়; আমি দাঁড়াইব। কক্ষে পাদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিব। কেন না, যদিও মনুষ্যজাতি স্ত্রী পুত্র বেষ্টিত সংসারে থাকিয়া বহুদিন হইতে নির্ব্বিবাদে হাসিয়া কাঁদিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছিল; এবং সেজন্য কখন কেহ একদিনও ঘরের বাহির হয় নাই;—তথাপি যে মুহূর্ত্তে দুঃখীর জন্য চিন্তায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, অমনি হঠাৎ ভোর না হইতেই কপিলবস্তুর সিংহাসন শূন্য করিয়া রাজপুত্র গহনবনে ছুটিয়া গেলেন। সুতরাং সে দুঃখ করিতেছে আর আমি বসিয়া চিন্তা করিব; তাহা হইতেই পারে না। অন্ততঃ 'সে কি মনে করিবে' তা' ভাবিয়াও আমি একবার তাহার জন্য দাঁড়াইব।

তুমি বুঝি জিজ্ঞাসা করিতে চাও সেই মানুষটি দুঃখ করিতেছে কেন? দেখ, মানব জীবনে গভীর জিনিষের "কেন" খুজিয়া মিলেনা। এই 'কেন'র যে উত্তর নাই তা'নয়, আমরা জানিনা। কতটুকুই বা জানি? আর যা জানি তাই যে কি তারওত ঠিক নাই।

সে মিথ্যা কথা বলে না,—সে বড়ই দুঃখ করিতেছে;—আমি বিশ্বাস করি। দুঃখে মানুষ শুধু জ্ঞাতা নয় ভোক্তাও বটে। জীবনের পাত্র হইতে সে মাঝে মাঝে স্বাদ গ্রহণ করে। কখনো বা মিষ্ট মধুর, কখনো বা বিরস তিক্ত। দুঃখের স্বাদ আছে, তা যে পায় সে সত্যই বলে; দুঃখ মিথ্যা করিয়া বলিবার নয়। আমি নিজে কখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না "ওগো তোমার কিসের দুঃখ"? দুঃখ, তা আবার কিসের;—কিসের নয়? ত্যাগে দুঃখ, ভোগে দুঃখ,

বিরহে মিলনে দুঃখ। দুঃখ জীবন ভরিয়া, মৃত্যু ছাপাইয়া ফেনিল তরঙ্গরাশির মত উছলিয়া উঠিতেছে। সৃষ্টি দুঃখে ডুবিয়া আছে।

তবু যদি জিজ্ঞাসা কর "কেন"? তবে সে নিজে এই "কেন"র যে উত্তর দিয়াছে তাই বলি,—বলিব? "দেখা হইল না বলিয়া"! তুমি যে হাসিয়াই উঠিলে হে! কেন, দেখা হইল না ব্যাপারটা কি এতই তুচ্ছ? না—তা'ত নয়। 'দেখা হইল না' ইহা ভাবিয়া কত সময়ে হৃদয়ের নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসে,—মনে হয় আছা যদি একবার হইত। শুধু চোখের—শুধু নিমিষের,—একটু দেখা; তার জন্য সমস্ত জীবন কি বিনিময় করা যায় না? যায়। মানুষ হৃদয়ের আবেগে যাহা করিতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়া উঠিতেই পারি না। হৃদয়-ধর্ম্ম জটিল!

আমরা যাহা হাসিয়া উড়াই, তাহা যদি তলাইয়া দেখি তবে বোধ হয়, না কাঁদিয়া থাকিতে পারিনা। "দেখা হইল না বলিয়া" যে দুঃখ হয় জীবনের ইতিহাস তাহা ভুলিতে পারেনা। অশ্রুত শুধু জল নয়, তার দাগ কি এত সহজে মুছিবার?

"দেখা হইলনা বলিয়া" যে দুঃখ হয় তাহা আমি জানি;—সে দুঃখকেও আমি মানি বিদায়কালে চারিদিকে চাহিয়া শূন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বিশ্বের সৃষ্টি সম্মুখে ছায়ার মত ভাসিয়া বেড়ায়। আহা, সে যদি শুধু একটিবার আসিত। সকলকে দেখিল আমাকে দেখিল না, তাই যদি সত্যই সে দুঃখ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমি না ভাবিয়া থাকি কেমন করিয়া?—উঠিয়া, বসিয়া, হাইতুলিয়া—ঘুমাইয়া, যে রকমেই হউক আমি তাহাকে ভাবিব—নিরন্তর ভাবিব। * * * —ওঃ-আকাশ যে একেবারে পরিষ্কার! ইস্! দুই একটা নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে উঁকি মারিতেছে।

গিরিজাশঙ্কর।

রাজা অশোক।

পৃথিবীতে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা অনন্য সাধারণ ক্ষমতায় চির-দিনের নিমিত্ত ইতিহাসে স্বকীয় গৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাঁহাদের অন্যতম। প্রাচীন ভারতের অন্ধকার গগন এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের আভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। প্রবল প্রতাপযুক্ত অধীশ্বর, আসমুদ্র ভারতবর্ষের সম্রাট, যে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালে জগতের এক তৃতীয়াংশ লোকের আশ্রয়, তাহার প্রধান বিস্তৃতি-সাধক এই মৌর্য্যকুল রবির কীর্ত্তি, যতদিন জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব থাকিবে ততদিন বিলুপ্ত হইবার নহে।

অশোকের জীবনবৃত্ত বলিবার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সুদূর অতীতকালে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতসাম্রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সম্ভবপর, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষ চিরকালই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল—ইহার অধিকাংশ ভাগ একত্রিত করিয়া কখনও কোনও সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেবের জন্মকালে উত্তর ভারতবর্ষ মগধ, কোশল, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজতন্ত্র এবং মল্ল বৃজি প্রভৃতি সাধারণতন্ত্র অনু-যায়ী শাসিত মোট ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনও উত্তর ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ মগধ রাজ্য এবং অন্যান্য কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এক অভিনব পরিবর্ত্তনের সূত্র-পাত হইল। বীরবর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের অনতিকাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন প্রতিভাশালী যুবক স্বীয় বলবীর্য্য এবং কুটিল রাজ-নীতিজ্ঞ চাণক্যের সহায়তায় এই সমুদয় খণ্ড রাজ্য একত্রিত করিয়া সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। কেবল চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলে এবং চাণক্যের কূটমন্ত্রে এই মহৎ কার্য্য সাধিত হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্যক্রমে যে সময়ে তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও বাহুবল নিয়োজিত

করিয়াছিলেন সে সময়টি উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল। কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

বীরবর আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পূর্ব্বে আর কোন বিদেশী শত্রু সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিপর্যাস্ত করে নাই। আর্য্যাবর্ত্তের খণ্ড-রাজ্যের অধিপতিগণ সতত পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া, তাঁহাদের অনৈক্য জনিত দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কিন্তু যেদিন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কীর্ত্তিসমূহ—নরশোণিতে রঞ্জিত নদী, প্রান্তর, ভস্মীভূত জনপদ, বিদলিত শস্যক্ষেত্র, শূন্য লোকালয় প্রভৃতি মূর্ত্তিমান ধ্বংসের আকার পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চনদের ভীষণ শ্মশানকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছিল, সেইদিন ভারতবাসীর চেতনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। এসমুদয় কিসের ফল? কেবলমাত্র তাহাদের ঐক্যের অভাব। নতুবা বারত্বের যে নিদর্শন তাহারা দেখাইয়াছিল জগতে তাহা অতুলনীয়। এশিয়ার প্রান্ত হইতে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে আলেকজাণ্ডার যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন কেবলমাত্র পঞ্চনদের কয়েকটি খণ্ডশক্তির সহিত সংঘর্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক আয়াস আবশ্যক হইয়াছিল। ক্ষুদ্র অসকণীয় জাতি যে বিপুল উদ্যম ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এক মহাবল প্রাশিষ্টি দুর্গ অধিকার করিতে আলেকজাণ্ডারের সমস্ত রণকৌশল নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। একা পুরু তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, সমস্ত পশ্চিম এসিয়ার অধীশ্বর পারস্য সম্রাটও তাহা পারেন নাই। এই উদ্যম ও সাহস যদি খণ্ড খণ্ড-ভাবে নিয়োজিত না হইয়া সম্মিলিত আকারে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে বীরবর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষীয় অভিযানের ফল অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই। সমসাময়িক ভারতবাসীগণ ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিসমুদয় একীভূত না হইলে, যে কোন বিদেশী শত্রু যে নির্ম্মমরূপে তাঁহাদিগকে পদদলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, এই নিদারুণ সত্য ভারতবাসীর মনে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সাম্রাজ্য গঠনাভিলাষী তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন যে তাঁহার ক্ষেত্র পরিস্কার। তাই এত সহজে আজন্মবিচ্ছিন্ন খণ্ড-রাজ্য সমুদয় তিনি এক শাসনে বাঁধিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বিপুল সাম্রাজ্য গঠনে সফলকাম হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা। তাঁহার নাম অনুসারে নব

প্রতিষ্ঠিত বংশ মৌর্য্যবংশ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার এই বংশের দ্বিতীয় রাজা। তাঁহার সময় পূর্ব্বে কলিঙ্গ রাজ্য ব্যতীত দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অবশিষ্ট ভূভাগ, এবং আফগানিস্থান মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মহারাজা অশোক এই বিন্দুসারের পুত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে অশোকের ইতিবৃত্ত একদিন অতীতের তিমিরগর্ভে বিলীন ছিল, কেবলমাত্র কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়টি অদ্ভুত জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই অশোকের ইতিহাস বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের পুরাতত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। কয়েকটি মনস্বী প্রত্নতত্ত্ববিদের অসাধারণ আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফলে, জগতের পুরাতত্ত্ববিষয়ে এত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে আমাদের সম্মুখে এক সম্পূর্ণ নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন ও আসিরীয় প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বিষয়েও কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান হইয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ আমরা অশোকের বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্ব্বত ও শিলাস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণকরে। এ সমুদয় শিলালিপি একপ্রকার অপরিচিত অক্ষরে লিখিত। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরাও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন না। বৎসর বৎসর এইপ্রকার নূতন লিপি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধারের কোন উপায় হইল না। নানারূপ গবেষণা চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন ইহা জ্যোতিষিক চিহ্ন, কাহারও কাহারও মতে এ সমুদয় গ্রীক অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হইল। কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতে নহে স্মরণাতীতকাল হইতে এই লিপিগুলি এইরূপে স্বীয় দুর্ভেদ্য রহস্য দ্বারা কত জনসমাজের বিস্ময় ও আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং নীরব ইহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে! সুদূর অতীতে পাঠান সম্রাট ফিরোজ সা ইহার একটি স্তম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে স্থাপন করেন; তদুপলক্ষে মহম্মদ আমিন তাঁহার ‘হাকতাকলিম’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন “এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে একপ্রকার অক্ষর খোদিত রহিয়াছে, সমস্ত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হন

নাই। জনপ্রবাদ এইরূপ যে কোন হিন্দু নরপতি স্বীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার মানসে ইহা প্রোথিত করেন, কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যান্য এত কিংবদন্তী প্রচলিত যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি এই লিপিগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বাহির করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হইলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহার উপসংহার ভাগ এইরূপ "যখন বিবেচনা করা যায় যে পারসিপোলিস ও ইজিপ্ট দেশীয় অদ্ভুত অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাঠ করিতে পারিয়াছেন, তখন এই অক্ষর গুলির প্রকৃত পাঠ এতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকা আমাদের দেশীয় (অর্থাৎ ইংরাজ জাতীয়) পণ্ডিতদের কলঙ্ক স্বরূপ বলিতে হইবে। এবং আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই, যে পুনরায় এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হউক; কারণ আমার ভয় হয় পাছে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী জর্ম্মান পণ্ডিতেরা সভ্য জগতের নিকট এই লিপিগুলির প্রথম পাঠোদ্ধারের বিপুল সম্মান প্রাপ্ত হয়েন।" কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য বিধান! জার্ম্মান পণ্ডিতের যে সম্মান কল্পনা করিয়া প্রিন্সেপ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি নিজেই কিছুদিন পরে সেই সম্মানের অধিকারী হইলেন। চতুঃবর্ষব্যাপী অতুল অধ্যবসায়ের ফল স্বরূপ অবশেষে তিনি এই দুর্ব্বোধ অক্ষরগুলির প্রথম পাঠোদ্ধার করিলেন। তিনি যে যে উপায়ে এই অভিলষিত ফললাভ করেন, তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক। তিনি প্রথমে দিল্লী, এলাহাবাদ ও বেতিয়াতে প্রাপ্ত খোদিত লিপিগুলির প্রতিকৃতি আনাইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বরবর্ণ চিহ্নগুলি বিশেষ রূপ লক্ষ্য করিয়া তিনি এই মন্তব্যে উপস্থিত হইলেন, যে ইহা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষা। দ্বিতীয়তঃ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে এই তিনটি খোদিত লিপিরই প্রথম পঞ্চদশটি অক্ষর এক। এই প্রকার আরও কোন সাদৃশ্য আছে কি না ইহা পরীক্ষা করিতে করিতে, তিনি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিলেন যে তিনটি খোদিত লিপিই একখানি লিপির তিনটি প্রতিকৃতি মাত্র। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই সমুদয় লিপিরই একজন মাত্র প্রণেতা। এই আবিষ্ক্রিয়াতে তাঁহার আরও এক উপকার হইল। প্রত্যেক খোদিত লিপির যে স্থান ভগ্ন বা অস্পষ্ট ছিল

...পর দুই খানির সাহায্যে তিনি তাহা পূরণ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ লিপি প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে তাঁহার অনুসন্ধানে বিশেষ সুবিধা হইল।

অপর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে প্রত্যেক সংযুক্ত বর্ণেই, কোন বিশেষ দুইটি অক্ষরের মধ্যে, একটি না একটী সর্ব্বদাই বিদ্যমান। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান হইতে তিনি এ দুটীকে 'য' ও 'ব' বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ইহার মধ্যে একটি দেখিতে সংস্কৃত 'ব' এর ন্যায়। তিনি সেইটিকে 'ব' এবং অপরটিকে 'য' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে একটী সংযুক্ত-বর্ণ কেবলমাত্র পদের শেষেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি ধরিয়া লইলেন যে ইহা সম্বন্ধ চিহ্নবাচক 'স্য'। যে অক্ষরটীকে তিনি 'থ' মনে করিয়াছিলেন তাহাও এই সংযুক্তবর্ণে আছে দেখিয়া তাঁহার ধারণা দৃঢ়মূল হইল।

এইরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে সহসা একদিন এক অভিনব প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইল। ভোপালের অন্তর্গত সাঁচি নামক স্থানে এক বৃহৎ স্তূপ আছে। তাহার গাত্রে এই অপরিচিত অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি-পংক্তি ছিল। প্রিন্সেপ একদিন সহসা লক্ষ্য করিলেন যে এই সমুদয় পংক্তির প্রত্যেকটির শেষ দুইটি অক্ষর এক এবং তাহা মূল পংক্তি হইতে একটু পৃথক করিয়া লিখিত। প্রথম তাঁহার মনে হইল হয়ত ইহা কোন মৃত ব্যক্তির স্মরণ চিহ্ন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে আভা নগরীর বৌদ্ধ মন্দিরে কেহ কিছু দান করিলে, তাহা মন্দির গাত্রে লিখিয়া রাখে সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে ইহাও সম্ভবতঃ কোন উপাসকের দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছে। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে এই শেষোক্ত কথাটির পূর্ব্বের অক্ষর অধিকাংশ স্থলেই 'স'—।—দুই একদিন পূর্ব্বে তিনি একটি সৌরাষ্ট্র মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি জানিতেন যে, একবচনান্ত সম্বন্ধবাচক পদের শেষে 'স' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'অমুকের দান' ইহাই তবে প্রত্যেক ক্ষুদ্র লাইনের অর্থ। স্বরবর্ণ চিহ্নের বিন্যাসস্থান এবং অনুস্বার চিহ্ন দেখিয়া তিনি সহজেই ইহাকে 'দানং' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং দুর্ব্বোধ্য দুইটি অক্ষর তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। চারি পাঁচ বৎসর প্রাচীন লিপি পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি তাঁহার এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে এই দুইটি অক্ষরের সাহায্যে তিনি শীঘ্রই

নাই। জনপ্রবাদ এইরূপ যে কোন হিন্দু নরপতি স্বীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার মানসে ইহা প্রোথিভ করেন, কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যান্য এত কিংবদন্তী প্রচলিত যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।”

পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি এই লিপিগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বাহির করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হইলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহার উপসংহার ভাগ এইরূপ “যখন বিবেচনা করা যায় যে পারসিপোলিস ও ইজিপ্ট দেশীয় অদ্ভুত অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাঠ করিতে পারিয়াছেন, তখন এই অক্ষর গুলির প্রকৃত পাঠ এতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকা আমাদের দেশীয় (অর্থাৎ ইংরাজ জাতীয়) পণ্ডিতদের কলঙ্ক স্বরূপ বলিতে হইবে। এবং আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই, যে পুনরায় এ বিষয়ে তাঁহা-দের মনোযোগ আকৃষ্ট হউক্ ; কারণ আমার ভয় হয় পাছে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী জর্ম্মান পণ্ডিতেরা সভ্য জগতের নিকট এই লিপিগুলির প্রথম পাঠোদ্ধারের বিপুল সম্মান প্রাপ্ত হয়েন।” কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য বিধান! জার্ম্মান পণ্ডিতের যে সম্মান কল্পনা করিয়া প্রিন্সেপ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি নিজেই কিছুদিন পরে সেই সম্মানের অধিকারী হইলেন। চতুঃবর্ষব্যাপী অতুল অধ্যবসায়ের ফল স্বরূপ অবশেষে তিনি এই দুর্ব্বোধ অক্ষরগুলির প্রথম পাঠো-দ্ধার করিলেন। তিনি যে যে উপায়ে এই অভিলষিত ফললাভ করেন, তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক। তিনি প্রথমে দিল্লী, এলাহাবাদ ও বেতিয়াতে প্রাপ্ত খোদিত লিপিগুলির প্রতিকৃতি আনাইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পরীক্ষা করিতে লাগি-লেন। স্বরবর্ণ চিহ্নগুলি বিশেষ রূপ লক্ষ্য করিয়া তিনি এই মন্তব্যে উপস্থিত হইলেন, যে ইহা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষা। দ্বিতীয়তঃ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে এই তিনটি খোদিত লিপিরই প্রথম পঞ্চদশটি অক্ষর এক। এই প্রকার আরও কোন সাদৃশ্য আছে কি না ইহা পরীক্ষা করিতে করিতে, তিনি সবিস্ময়ে আবি-ষ্কার করিলেন যে তিনটি খোদিত লিপিই একখানি লিপির তিনটি প্রতিকৃতি মাত্র। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই সমুদয় লিপিরই একজন মাত্র প্রণেতা। এই আবিষ্ক্রিয়াতে তাঁহার আরও এক উপকার হইল। প্রত্যেক খোদিত লিপির যে স্থান ভগ্ন বা অস্পষ্ট ছিল

অপর দুই খানির সাহায্যে তিনি তাহা পূরণ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ লিপি প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে তাঁহার অনুসন্ধানে বিশেষ সুবিধা হইল।

অপর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে প্রত্যেক সংযুক্ত বর্ণেই, কোন বিশেষ দুইটি অক্ষরের মধ্যে, একটি না একটী সর্ব্বদাই বিদ্যমান। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান হইতে তিনি এ দুটীকে 'য' ও 'ব' বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ইহার মধ্যে একটি দেখিতে সংস্কৃত 'ব' এর ন্যায়। তিনি সেইটিকে 'ব' এবং অপরটিকে 'য' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে একটী সংযুক্ত-বর্ণ কেবলমাত্র পদের শেষেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি ধরিয়া লইলেন যে ইহা সম্বন্ধ চিহ্নবাচক 'স্য'। যে অক্ষরটীকে তিনি 'থ' মনে করিয়াছিলেন তাহাও এই সংযুক্তবর্ণে আছে দেখিয়া তাঁহার ধারণা দৃঢ়মূল হইল।

এইরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে সহসা একদিন এক অভিনব প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইল। ভোপালের অন্তর্গত সাঁচি নামক স্থানে এক বৃহৎ স্তূপ আছে। তাহার গাত্রে এই অপরিচিত অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি-পংক্তি ছিল। প্রিন্সেপ একদিন সহসা লক্ষ্য করিলেন যে এই সমুদয় পংক্তির প্রত্যেকটির শেষ দুইটি অক্ষর এক এবং তাহা মূল পংক্তি হইতে একটু পৃথক করিয়া লিখিত। প্রথম তাঁহার মনে হইল হয়ত ইহা কোন মৃত ব্যক্তির স্মরণ চিহ্ন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে আভা নগরীর বৌদ্ধ মন্দিরে কেহ কিছু দান করিলে, তাহা মন্দির গাত্রে লিখিয়া রাখে সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে ইহাও সম্ভবতঃ কোন উপাসকের দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছে। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে এই শেষোক্ত কথাটির পূর্ব্বের অক্ষর অধিকাংশ স্থলেই 'স'—।—দুই একদিন পুর্ব্বে তিনি একটি সৌরাষ্ট্র মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি জানিতেন যে, একবচনান্ত সম্বন্ধবাচক পদের শেষে 'স' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

'অমুকের দান' ইহাই তবে প্রত্যেক ক্ষুদ্র লাইনের অর্থ। স্বরবর্ণ চিহ্নের বিন্যাসস্থান এবং অনুস্বার চিহ্ন দেখিয়া তিনি সহজেই ইহাকে 'দানং' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং দুর্ব্বোধ্য দুইটি অক্ষর তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। চারি পাঁচ বৎসর প্রাচীন লিপি পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি তাঁহার এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে এই দুইটি অক্ষরের সাহায্যে তিনি শীঘ্রই

অবশিষ্টগুলি চিনিতে পারিলেন। এইরূপে কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি সহস্র বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন। সার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে যে লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে পণ্ডিতগণ বিফল মনোরথ হইয়াছেন, প্রিন্সেপ তাহার প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়া দেখাইলেন যে, এসমুদয় দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী নামক রাজার খোদিত ধর্ম্মলিপি। কিন্তু এই 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' কে তাহার কিছুই নিরূপণ হইল না। ভারতবর্ষে প্রিয়দর্শী নামক রাজার বিষয়ে কোন কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই, পুরাণে বর্ণিত রাজাগণের তালিকার ভিতরও উক্ত নামের অস্তিত্ব নাই। সিংহলে ঐ নামে এক রাজার কথা তদ্দেশীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এসমুদয় তাহারই কীর্ত্তি বলিয়া প্রথমে সাধারণে পরিচিত হইল। কিন্তু সুবিখ্যাত টার্ণার সাহেব প্রথমে প্রমাণ করেন যে "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী" মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোকেরই নামান্তর। প্রমাণস্বরূপ তিনি মহাবংশ হইতে নিম্নলিখিত লাইন কয়টি উদ্ধৃত করেন।

"ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র প্রিয়দর্শীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়" (অন্যান্য প্রমাণের নিমিত্ত ১৮৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা দেখুন।) এই সময় হইতে অশোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। কালক্রমে আরও বিবিধ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই লিপির সাহায্যে ও গভীর গবেষণা দ্বারা অশোকের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার সারাংশ বিবৃত করিব।

কিন্তু কেবল এই নিমিত্তই এ লিপিগুলি প্রসিদ্ধ নহে। ইহাদের অক্ষর ভারতবর্ষের আদিম বর্ণমালা এবং ভারতে আর্য্যজাতির অন্য সমস্ত বর্ণমালা, ইহা হইতে উদ্ভূত। কিপ্রকারে কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে এই এক বর্ণমালা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে, পণ্ডিতেরা বিশদভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আবিষ্ক্রিয়া হইতেই ভারতীয় বর্ণমালা বিজ্ঞানের (Palaeography সৃষ্টি। অশোকের পরবর্ত্তী সময়ের যে শত শত খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধারও প্রধানতঃ এই অক্ষরের সাহায্যেই হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অশোকলিপির পাঠোদ্ধার একটি স্মরণীয় ব্যাপার। মাণ্টা, বেহিস্থান ও রোসেটার খোদিত লিপি তত্তদ্দেশীয়

বর্ণমালা বিজ্ঞানের নিমিত্ত যে সাহায্য করিয়াছে অশোক লিপিও ভারতবর্ষের পক্ষে তদ্রূপ করিয়াছে সন্দেহ নাই। অশোকলিপি ইহাদের মধ্যে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিরোলগ্রামে ১২২৮ সালে বৈদ্যবংশে মহাত্মা চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জন্ম হয়, এবং সন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি একজন সহৃদয় কবি এবং সংস্কৃত সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।

যখন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার মসনদে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পূর্ব্বতন পুরুষ, স্বর্গীয় চিন্তামণি কবিরাজ, একদিন নবাব বাহাদুরকে একটী কঠিন রোগ মুক্ত করায় তাঁহার নিকট একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি সেই নবাব প্রদত্ত জায়গীর অবলম্বন করিয়া একটী দেব সেবা ও একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বহু বিদেশাগত ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার সেই চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজা রাজবল্লভের পৌত্রও একদিন 'চিন্তামণি চতুষ্পাঠীতে' আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "প্রয়োগামৃত" নামে চিন্তামণি প্রণীত একখানি অতিসুন্দর আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহগ্রন্থ আছে, সেখানি আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

অধ্যাপক চিন্তামণির অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই সুপণ্ডিত ও চিকিৎসা কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার বংশধরগণ সকলেই পুরুষপরম্পরায় সেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাদি করিতেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাবিনোদও সেই চতুষ্পাঠীতে তাঁহার পিতা, অধ্যাপক গুরুদাস কাব্যচঞ্চুর নিকট সংস্কৃত সাহিত্যাদি, আয়ুর্ব্বেদ ও বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, তিনিও যাবজ্জীবন অধ্যাপনাদি ও চিকিৎসা কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক মনোহরসাহীর সঙ্কীর্ত্তন

গায়ক তাঁহার নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখনকারকালে তাঁহার মত সুকবি আর কেহ সেস্থানে ছিলেন না। তাঁহার রচিত সংস্কৃত ছন্দে নানাবিধ 'নৌকাবন্ধ' 'অট্টালিকাবন্ধ' 'পদ্মবন্ধ' গৌরাঙ্গরূপ বর্ণন প্রভৃতি শ্লোকাবলী তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তিনি বৈদ্যজাতীয় হইয়াও সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভায় সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া পাণ্ডিত্যসম্মান লাভ করিতেন। খ্যাতনামা রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি পণ্ডিত সমাজের অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন।

তিনি কেবল সংস্কৃত কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, বাঙ্গলা সাহিত্যেও তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কখনও তাঁহার রচনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। কদাচিৎ হরিসভা, হরিবাসর, নগর সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিতে গ্রামস্থ লোকের অনুরোধে যে সকল পদাবলী রচনা করিয়া দিতেন, তাহাই আমরা লোকমুখে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সেই কয়টী আজ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। তিনি শান্তভাবে নিভৃত পল্লীতে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, কখনও আত্মখ্যাতি প্রচারের জন্য লেশমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। নতুবা আমরা আজ তাঁহার রাশি রাশি কবিতা গ্রন্থ দেখিতে পাইতাম।

আমরা যে কয়টী তাঁহার গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা দ্বারাই তাঁহার কবিত্বশক্তি, হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভক্তিময় ভাব ও জগদীশ্বরের নিকট প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ স্পষ্টতই অনুভব করিতে পারি।—যথা—

বাউলের সুর—একতালা।

কে তুমি তোমারে কেন ডাকে সবে।
সুধাই তাই সুধামাখানাম দেখা পাইহে ভবে।

সুধাই বারম্বার, ওহে শূন্যদার,—
এত পরিবার কি সম্ভবে।
তোমার কেবা মাতা, ওহে জগৎ পিতা,
কোথায় জন্ম না পাই অনুভবে।
জলে বা জঙ্গলে, থাক সিন্ধু কূলে,
নৌকামূলে থাকহে কি লাভে।

থাক গর্ভিনী—উদরে,　　গর্ভ রক্ষা করে,
বলির দ্বারে দ্বারী কি অভাবে ।
আবার শুনি পুরাণেতে,　　তুমি বৃন্দাবনেতে,
ধেনুগণে রাখ বেণুর রবে ।
হেথা চন্দ্রনারায়ণ,　　ভাবে নারায়ণ,
পরকালে সে গুহ্যভাবে ।

সঙ্কীর্ত্তন ।

তাল—তেওট্ ।

মনরে গেল সময়, সেই দয়াময়, ভাব্‌লিনে একবার
কিসে হবি ভবসিন্ধু পার ।
সামান্য শমন কিসে, তার কাছে তুই তর্‌বি কিসে,
বসে বসে টানছে বাকী সে,
কি সেবা করিলে পাবি, কিসে বা নিস্তার ॥

(খাদ)

মনরে, পরিণামে হবে কুশল, হরি হরি বল ।
যখন হবে কণ্ঠ অবরোধ,
মান্‌বে না তোমার অনুরোধ,
যমাগারে হবেরে বিরোধ—
তখন এ গৃহধন কোথায় রবে,—কোথায় পরিবার ।

(লোফা)

ধরাতলে পরিবারে, কি করিবে রে তোর পরিবারে,
(ও তোর কেহতো সঙ্গে যাবে নারে)
শ্মশানে দেবে ফেলে, তখন কে লইবে কোলে
হরি বিনে গতি কিরে আর ।
তখন কে দুঃখ নিবারে, ভব পারাবারে,
তাতেই বলি হরিবল বারে বারে ।

একতালা।

ও তোর—ভয়ঙ্কর কণ্ঠরবে, সকলে নীরবে রবে,
শব দেখি সব পলা'বে তখন কিহবে কিহবে,
একবার ভাবরে।
ও তোর—কফপূর্ণ দেহ নদী, হবে তোমার সেই অবধি
ও তোর—নিজ দেহ ছাড়ি বায়ু, সঙ্গে লয়ে পরমায়ু
ছিদ্র অন্বেষিয়ে—বায়ু যাবেরে।

---

* উত্তমচাঁদের সুর।

একতালা।

একবার চাওহে হরি দয়াকরি, অধম কাঙাল পানে।
আমার কেহ নাই ভব অন্ধকূপে প'ড়ে মরি প্রাণে।
(তুমি দীন দয়াময় অধম তারণ)
হাতে ধরে নাওহে তুলে, দুঃখী বলে বিনামূলে
নিবাস দাও ঐ চরণ কমলে।
আমায় পতিত দেখি ভবকূপে, শমনবেটা আছে কুপে,
তাইতে বলি চুপে চুপে, তোল তুমি কোনরূপে,
সঁপে দিই মনপ্রাণ ঐ চরণে।
(এ জনমের মতন হে হরি।)
অনুগত জনে নাথ, কাঁদাও কেন অবিরত,
এ নহে তোমার উচিত।
দেখ,—ছ'জনায় মন্ত্রনাকরে, প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে,
সঞ্চিতার্থ অধিকার করে।

---

* মহাত্মা রামপ্রসাদের সুর যেমন সর্ব্বজনবিদিত, তেমনই উত্তমচাঁদের সুর মনোহরসাহী পরগনার সকলেরই বিদিত। আমরা সময়ান্তরে তাঁহার সংক্ষিপ্তবিবরণী ও গীতাবলী "বীর-ভূমিতে প্রকাশিত করিব। ইতি লেখক।

তারা—নিলে সোণা পিতল দিয়ে, আমারে বোকা বানিয়ে
চক্ষে বিষয় বালি দিয়ে, সংসার স্তম্ভে থুয়ে
বেঁধে গেছে আমায় মায়াগুণে।
হরি তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, তুমিহে জগতের গুরু,
তুমি দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু, বঞ্চিত করোনা আমায় বিন্দুদানে।
(সিন্ধু শুখাবে নাহে হরি।)
দারা পুত্র ধন কড়ি, আমার আমার করে' মরি,
পরের ধনে ধোপা ভাণ্ডারী।
যখন দেহ ছাড়ি প্রাণ যাবে, দারা পুত্র কোথায় রবে,
ও তোর কোথায় রবে বিষয় ধন, কোথায় নিজ পরিজন,
অন্বেষিবে তখন গুপ্তধনে।
বাবা বলে' যাও বলে'।)
তুমি হরি জগৎ তাত, সে সম্বন্ধে আমিও পুত্র,
পিতার ধনে সমান হে সত্ব।
যদি বল যোগী যোগসাধনে, পাবে তোমার চরণ ধনে,
তুমি কৈলে অঙ্গীকার, তুল্য সে সবার
জগৎ-বাসী জীব জন্তুগণে।
এখন ধন্দ হয়ে বলে চন্দ্র, আমি অজ্ঞানান্ধপুত্র,
শূন্যভাগী স্মৃতির বচনে।
তাইতে—ধনেরভাগী চাইনে হতে, শাস্ত্রমতে পাইতো খেতে,—
সে তুলসীদল মিশ্রপদজল,—
বঞ্চিত করোনা আমায় তাহা দানে।
(আমার প্রাপ্যধন হে হরি।)

বাউলের সুর—একতালা॥

মন, রসনা স্ববশ রাখরে এই বেলা।
ভুলনা ব্যধির মহৌষধি হরি হরি বলা।
হ'লে ভবরোগাক্রান্ত, কুপথ্য নিতান্ত,
সদা রুচি মিথ্যা ঝোল অম্বলে।

তাহে প্রবঞ্চনা দধি, খাচ্ছ নিরবধি,
সাধুসঙ্গ দশমূলে হেলা।
(আর বাঁচ্‌বি কিসে ?)
জীবে ভবরোগেরুগ্ন, দেখিয়ে উদ্বিগ্ন,
গৌর বৈদ্য এলেন নদেপুরে।
ও তাঁর ঔষধ অভিরাম, সুধারস নাম—
(কেবল হরি হরি বলা।)
পিব জীব, যাবে রোগের জ্বালা।
(ম'লে ও বাঁচ্‌বিরে।)
একজন বৈদ্য উদর রোগে, চিরকাল ভোগে,
নাম শুনে দাঁড়ায়ে আছে পথে।
তারে ঔষধি সেবনে, পাঠাও সে বনে,
যে বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা।

বাউলের সুর—একতাল্য।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বল্‌রে মন, মধুর হরিনাম—
জিহ্বারে সহায় ক'রে।
দেখ বেদে রামায়ণে, ভারত পুরাণে,
সবে বিস্তারিছে হরিগুণ গান।
ও শিব গাহিছে সুধারে, কতই বা সুধা রে,
পঞ্চাননে তাই ডেকে সুধারে।
নিতাই গৌর আজি, ভবের ঘাটে মাঝি,
নৌকাপাতি বসিলেন দুটী ভাইরে।
ডাক্‌ছেন হরি ২ বলে, আয়রে পাপীর দলে,
সবে লয়ে যাবো ভবপারে।

সঙ্কীর্ত্তন।

(তাল—তেওট।)

আজি হরিসংকীর্ত্তনে, নানারঙ্গে নদের নিতাই গৌর নাচিছে।
দেখে জগাই মাধাই, বড়দয়াল নিতাই যায় কাছে।
নিতাই বলে, জীব করে ধরি—একবার বলরে হরি,—
　　　　দিনসব যায় মিছে।

(লোফা)

মধুর নামটী শুনে শুনে, জুড়াইল পশুপক্ষী গণে ;
যে নাম নারদ জাগায় বীণার তানে ;
পঞ্চানন গায় পঞ্চাননে, পারে যাবি নামের গুণে ;
দূরে যাবেরে দূরিত, রবিসুত দ্রুত পলায়ে
　　　　যাবে ভবনে।

(দশকুশী)

তখন হরি ২ বলি বদনে, নিতাই ফিরি' জীবে দ্বারে দ্বারে,
বলে এনেছিরে, মধুর হরিনাম এনেছিরে,—
　　　　কেবল তোদের লাগি।

আমরা প্রবন্ধান্তরে তাঁহার জীবনের অনেক শিক্ষনীয় কথা, ও সংস্কৃত কবিতাসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিব। ইতি

শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ।

কবি রজনীকান্ত—স্মরণে।

এখনো বেশী দিন হয় নাই, কবির কণ্ঠে গান শুনিয়াছি—সে সঙ্গীত এখনও কাণে বাজিতেছে, কর্ণে এখনো তার রেশ আছে, প্রাণে তো চিরদিন থাকিবেই। বাঙ্গালীর মনে একটা আশঙ্কা কিছুকাল হইতে জাগিয়াছে যে বাঙ্গালা দেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে প্রতিভার দীপ্ত জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বুঝি নিবিয়া আসিতেছে ; বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে যে মনীষা ও মহত্ব ভারত-ইতিহাসে বাঙ্গালীর জন্য অভিনব স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, বাঙ্গালী বুঝি তাহা হইতে চ্যুত

হইয়া পড়ে। কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে দু' একটী জীবনের মধ্যে অসামান্যতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যেমন বিস্ময় তেমনি আনন্দ ও আশা স্বদেশ ভক্তের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোলে। এই আশা, বিস্ময় ও আনন্দ শোক-বাসরের অশ্রু-শ্বাসের মধ্যেও রজনীকান্তকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মহিমা গৌরবে আজ আমার অন্তঃকরণ শোককেও মগ্ন করিয়া দিতেছে। মনে পড়িতেছে এক দেবমূর্ত্তি, প্রশান্ত মহিমাময়, অধরে পরমানন্দের হাস্য-রেখা আঁখি দুটি শান্ত, তাঁহার দৃষ্টি আত্মসমাহিতের মত নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে।

রজনীকান্তের পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার জীবনী আলোচনার প্রয়োজন অধিক নয়, তাঁহাকে কবি বলিতে গিয়া কবির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক হয় না। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, এমন যুক্তিতর্কের প্রশ্নও মনে স্থান পায় না। তাঁহাকে আমরা এমনি ভাবে প্রাণের মধ্যে পাই। যাঁহার পরিচয় প্রাণে, তাঁহাকে মস্তিষ্কের সাহায্যে বোঝা বা বোঝান অসম্ভব। 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র সময়ে রজনীকান্ত যে পরিচয়ের জন্য জীবনীকারের দিকে চাহিতেন, 'অমৃত' ও 'আনন্দময়ী'র সময়ের রজনীকান্ত সে পরিচয় অভ্রান্ততর ও স্পষ্টতর-রূপে আপনি দিয়া গিয়াছেন। অন্য কবির জীবন তাঁহার কাব্যের অন্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু রজনীকান্ত তাঁহার কাব্য অতিক্রম করিয়া স্বপ্রকাশ হইয়া-ছেন। এখন কাব্যই তাঁহার জীবনবৃত্তের টীকা নহে, জীবনবৃত্তই তাঁহার কাব্যের টীকা, এবং সে জীবনবৃত্ত আগাগোড়া পড়িতে হয় না, এক অপরূপ উপসংহারে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

দূর হইতে গান শুনিতাম, সে গান গভীর, সুন্দর ও সত্য বোধ হইত; কিন্তু তাহাতে কবির প্রাণ—একটি হাসি ও অশ্রুভরা মানব হৃদয়, কি বর্ণে কি জীবন শোণিমায় রঞ্জিত করিয়া ভিজাইয়া দিত, আপনাকে তাহার মধ্যে কি মহান্ অথচ অবিকল রেখায় আঁকিয়া তুলিত, তাহা তত পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারি-তাম না। তারপর একদিন গান অতি নিকটবর্ত্তী হইল, গায়ককে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, মুখে বাক্য সরিল না। এ কোন কবি! কি গান গাহিতেছে! এ যে স্বর্গের অমৃতবিন্দু পান করিয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! ইঁহার গান—সে ত' শুধু হাসি কান্নার গান নহে, ক্ষুদ্র সংসার, তুচ্ছ জীবনের উপরেই

দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে—দৃষ্টি অতি ঊর্দ্ধে। রোগের দারুণ যন্ত্রণায় ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর মত; তথাপি মুখে Father; Father, why hast Thou forsaken me? নাই। বিশ্বাসের আনন্দে এতটুকু দাগ পড়ে নাই—গান পূর্ণ কণ্ঠ, তাহাতে ঊর্দ্ধলোকের সুসমাচার রহিয়াছে।

রজনীকান্ত কবি যে অর্থেই হউন, তাঁহার পদবী আরও উচ্চে, তিনি সাধক। কবি মানবকে সৌন্দর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের যে পরম এবং চরম অর্থ, সৌন্দর্য্য অনুভবের পর প্রাণের ভিতর যে আকুলতা—ক্ষুদ্র জীবনের হীনতা ও অসুন্দরতায়, চিরসুন্দর মহান্ এবং বিরাটের সহিত মিলনের জন্য যে অশান্ত ক্রন্দন, সাধক তাহারই সুর তোলেন। তাঁহার গানের ভাষা তত নাই যত আছে ভাব; তাঁহার কথা তত বেশী নাই, যত আছে অর্থ; বিস্তৃতি তত নাই, যত বেশী গভীরতা; এবং কলা-কৌশল তত নাই, যত বেশী আন্তরিকতা। তাহা হৃদয়কে অতি সরল সহজ পথে স্পর্শ করে, অন্তর মথিত করিয়া নেত্রপ্রান্ত সিক্ত করিয়া দেয়। সে ভাষা বিশ্লেষণ করা যায় না; এবং সে ভাব গ্রহণ করা যায়; কিন্তু বাক্যে তাহার অলোচনা সাধ্যাতীত। রজনীকান্ত সেই সাধক এবং সেই কবি। বাংলাদেশে আর একজনের নাম এই সঙ্গে করিতে পারি, তিনি রামপ্রসাদ। ইতি পূর্ব্বে কবির প্রসঙ্গে একাধিক সুধীজন এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমি এটা বড় করিয়া বলিতে চাহি। আমার বোধ হয়, এইটাই তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। রজনীকান্তকে আমরা এই যুগের রামপ্রসাদই বলিব। তিনি যেন রামপ্রসাদের Re-incarnation, দ্বিতীয় অবতার। কারণ তিনি যে শুধু রামপ্রসাদের মত ঐকান্তিক ভক্তি ও অকপট বিশ্বাসে ভগবানের নাম গান করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি তাঁহারি মত যোগ সাধনা করিয়াছেন; তাহা অষ্টাদশ শতাব্দের বঙ্গদেশের কৌলতন্ত্র অনুসারে নহে, তাহা এই বিংশ শতাব্দের স্বাভাবিক মানবতন্ত্রের অনুসারে। কোনটা অধিক দুরূহ, বিস্ময়কর বা পূজাই জানি না, কিন্তু তিনি, শবাসনে না হইলেও মৃত্যুর উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অথবা নিজেরি শবাবস্থায় সাধনা করিয়া মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এমন সাধনা মানব কখনও চক্ষে দেখে নাই, বাঙ্গালী দেখিয়াছে।

কবি বিশ্রুত মিশর মরালের কাহিনী কি এমন ভাবে কোথাও সত্য হইয়া উঠিয়াছে!

'বাণী' 'কল্যাণী' ও 'আনন্দময়ী' এই তিনখানি প্রধান কাব্যই উপস্থিত সাহিত্যে তাঁহার কবিশক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। 'অভয়া' এখনো যন্ত্রস্থ।* কিন্তু এই তিনখানিই তাঁহার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এগুলি সবই গান সংগ্রহ। তিনি গীতকবি, এবং ইহাই স্বাভাবিক। মানব প্রাণের যে কথাগুলি গভীর সত্য এবং সুন্দর, যাহা হৃদয় হইতেই বাহির হইয়া আসে তাহা সুর ছাড়া হয় না। অতএব যিনি গানের ভিতর দিয়াই আমাদের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মানব সাহিত্যের আদি কবির মত। তাঁহার ভাব অতি গৌরবময়, অতি প্রকৃত এবং আদিম সরলতায় অনুপ্রাণিত।

'বাণী'র মধ্যে ভগবৎ প্রেমের যে অঙ্কুর, নিরাশা ও আকুলতা তাহা 'কল্যাণী'তে শান্ত, যেন অবলম্বন পাইয়াছে। কবি যে লক্ষ্যের অভিমুখে আকর্ষিত হইয়া, সুর হইতে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছিলেন, পরবর্ত্তী কাব্যে সেই লক্ষ্যের অতি সম্মুখীন হইয়া বিশ্বস্তভাবে তাহার গান গাহিতেছেন। 'বাণী'তে

'ধরে' তোল, কোথা আছ কে আমার
একি বিভীষিকাময় অন্ধকার, ইত্যাদি।'

'কল্যাণী'তে

'অনন্তদিগন্তব্যাপী অনন্ত মহিমা তব
ধ্বনিছে অনন্তকণ্ঠে অনন্ত তোমারি স্তব।'

সাধনায় তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

'আনন্দময়ী'তে তিনি ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছেন। একেবারে নিজে কিছু গাহিতেছেন না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এখন নিশ্চিন্ত আনন্দময়। তাই বিশ্বজনের মুখপাত্রী মেনকা এবং স্বয়ং বিশ্বজননীর মুখেই তাঁহার গান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—আপনি যেন তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেছেন। এখন বাণী'র ভিতরে ও নহে, আশ্বাসের 'কল্যাণী'র মধ্যে ও নহে. এখন আনন্দময়ী তাঁহার প্রাণে শোকতাপহরা আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, কবি পীড়িত কণ্ঠে অমৃত আস্বাদ করিয়া তাহারি গান গাহিয়াছেন। কবি যে পিপাসার বারি পাইয়া এই আনন্দ বিলাইয়াছেন, সে পিপাসার দারুণতা ও প্রাণময়তার পরিচয়

* এই প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয় স্বর্গীয় কবি তখনও রোগ শয্যায়

'কল্যাণী'র 'ভক্তিধারা' ও 'প্রাণপাখী' শীর্ষক গীত দুইটির মধ্যে অতি স্পষ্ট পাওয়া যায়। যেমন পিপাসা, তাহার বারিও তেমনি প্রচুর ও শীতল।

কবি! আজ শরতে আবার আনন্দময়ীর আগমনী গান উঠিয়াছে। তোমার দেশে, আজ দীঘিতে দীঘিতে কুমুদকহ্লার দেবীর চরণরাগ ধারণ করিয়াছে। রজনী আবার জ্যোৎস্নাশালিনী হইবে! পূজার প্রাঙ্গণে বোধন আরম্ভ হইয়াছে। 'আনন্দময়ীর' গান কে গাহিবে? তোমার কণ্ঠ নীরব কেন? আমরা যে তোমায় বোধন বেদিকায় বসাইব, তোমার কণ্ঠে পরাইবার জন্য শেফালির মালা গাথিয়াছি। এস! এ উৎসবশালার কোন্ প্রান্তে তোমায় দেখিতে পাইব? তোমাকে না পাইলে যে এ উৎসব অঙ্গহীন হইবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ।

"রেখ"

দিবসের সর্ব্বশেষ বিদায়ের মত
　　তবু মনে রেখ তারে।
রেখ সুদূরের ক্ষীণ আভাসের প্রায়
　　তব প্রাণ সিন্ধু তীরে।
উৎসবের শেষ ক্লান্ত ধ্বনিটির মত
　　রেখ আহা মনের বাসরে।

অসময়ে ঝরা ফুল, তার ব্যথা সম,
　　স্মরি ও তাহারে।
সৌন্দর্য্যের সর্ব্বশেষ শীর্ণ অবসান
　　সম, তারে করিও চিত্রিত।
ভগন বীণার শেষ অসম্পূর্ণ তান
　　সম প্রাণে রাখিও লুণ্ঠিত।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

মানসিক।

১

সারাদিনমান পল্লীর পথে বিজনে,
রৌদ্র আতপে ক্লান্ত কপোত কূজনে
　　মনে হয় কোথা শান্তি শীতল
　　শ্বেত গম্ভীর মন্দিরতল,
ধ্বজা যার উড়ে আকাশের গায়,
শ্যাম তৃণে ছায়া আলিপনা পায়,
শুধু গুঞ্জন দূর হতে আসে
　　　　নীরবতা ঘন করি,—
আমি কবে সেথা পঁহুছিব তাই
　　　　আছিনু কেবল স্মরি।

২

সেথায় সন্ধ্যা নামিয়াছে মৃদু চরণে,
গোধূলি ধূসর দিবালোক ছায়া বরণে।
চন্দ্র উদিবে পূর্ব্ব কোণায়,
আঙ্গিনাটি যাবে ধুইয়া সোণায়।
আরতি-বেলায় শেফালির ফুল
বিকশি উঠিবে সুরভি আকুল,
ধূপের মধুর গন্ধ উতল
উঠিবে, দেউল ভরি,—
আমি কবে সেথা পঁহুছিব, তাই
রয়েছি কেবল স্মরি!

৩

কল কোলাহল থেমে যাবে সব সুদূরে,
নীরব রাগিনী বাজিবে আকাশে মধুরে
মন্দির তলে জাগিবে না কেহ,
পুরোহিত তুমি গৃহে চলে যেও!
আমিই জাগিব মুক্ত দুয়ারে,
অমৃত স্বপনে জ্যোৎস্না জুয়ারে—
নিবে যাবে শশী জাগিব বাসর
আঁধারের চেলি পরি'—
আমি কবে সেথা পঁহুছিব, তাই
আছিনু কেবল স্মরি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ।

"হাসি।"

(আলোচনা।)

এখানি হাসির গল্প ও কবিতা পুস্তক। সুন্দর কাগজে সুন্দর ও পরিপাটী-রূপে মুদ্রিত। ৭৫ পৃষ্ঠা পুস্তক, মূল্য।০ আনা। প্রকাশক সান্যাল এণ্ড কোং ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মলাটে একটি সুন্দর হাসির চিত্র, দেখিলেই হাসিতে হয়।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রামপুরহাটের পণ্ডিত মহাশয়'—আমাদের বীরভূমের সকলেরই নিকট সুপরিচিত ও অনেকেরই অন্তরঙ্গ আত্মীয়। পণ্ডিত মহাশয়ের স্বদেশহিতৈষণা, পরোপকার প্রভৃতি একদিকে আর অপর-দিকে তাঁহার সঙ্গীত কুশলতা ও হাস্যকৌতুকময় সামাজিকতা, পণ্ডিত মহাশয়কে বীরভূমবাসীর একেবারে আত্মীয় করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার গল্প তাঁহার মুখে অনেকেই শুনিয়াছেন, অনেক হাসিয়াছেন, হাসিতে হাসিতে যাহাকে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাওয়া বলে তাহাও অনেকের হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় একজন নিপুণ হাস্যকর গল্প রচয়িতা। তাঁহার সেই সমস্ত হাস্যোজ্জ্বল

গল্প, তিনি পুস্তকাকারে বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত হাসির উৎস, সকলেই আমোদিত হইবেন।

আজকাল সাহিত্যে খাঁটি স্বদেশী জিনিসের অভাব কিছু অধিক। বঙ্গের পল্লীসমাজের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি আছে, সামাজিক জীবনের একটা উৎসবময় কলহাস্য আছে; দুঃখের বিষয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার প্রতিধ্বনি সকল সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত মহাশয়ের এই 'হাসি' একেবারে নিখুঁত দেশী জিনিষ, ইহাতে একেবারে ভেজাল নাই। দেশের সকল লোকই ইহা পাঠে বিস্তর হাসিতে পাইবেন। দেশী রঙ্গরস অনেকের নিকট 'ভাঁড়ামি' এই আখ্যা লাভ করিয়াছে, নিতান্ত 'ভাঁড়ামি,' নহে অথচ দেশীয় হাস্যরসের উৎস এই গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যাইবে। সমস্ত গ্রন্থখানিই পণ্ডিত মহাশয়ের হাস্যোদ্দীপ্ত উষ্ণ হৃদয়ের সুরভিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। আমরা নমুনা স্বরূপ দুএকটি গল্প উদ্ধার করিতেছি।

(১)

একদিন এক ভট্টাচার্য্য রাস্তার ধারে বসিয়া দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব কর্‌ছেন সেই পথে আর এক ভট্টাচার্য্য যেতে যেতে দেখ্‌লেন অশাস্ত্রীয় প্রস্রাব—দক্ষিণ মুখে প্রস্রাব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁর প্রস্রাব হ'লে বল্লেন, "মহাশয়, ও কি রকম প্রস্রাব হোলো? ঘটাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা যোগেতে ক'রে, দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব ত অশাস্ত্রীয় প্রস্রাব!" তিনি বলিলেন "আরে তুমি লোকটা ত নিতান্ত বেল্লিক, অর্ব্বাচীন। দক্ষিণ মুখো নিষেধ না উত্তর মুখো নিষেধ।" এই নিয়ে দুজনে ঘোরতর বিতণ্ডা। এমন সময়ে, সেই পথ দিয়ে একজন চাষা লাঙ্গল ঘাড়ে করে চাষে যাচ্চে, দুজনে তাকেই বল্লেন, "দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব নিষেধ না উত্তর মুখো নিষেধ?" সে বল্লে, "ঠাকুর ম'শায় আমরা ওর কি জানি? আপনি যে মুখে বল্‌ছেন আমরা সে মুখেও পেচ্ছাব করি। আর উনি যে মুখে বল্‌ছেন ও মুখেও পেচ্ছাব করি। আমাদের ওর কিছু ঠিক নাই।"

(২)

জগন্নাথকে পায়স দান।

কোন একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন হোচ্চে। শেষে পায়স

পরিবেশনের সময় এক ভট্টাচার্য্য বল্লেন "মহাশয়! আমাকে পায়েসটা দেবেন না!" গৃহস্থ বল্লেন "কেন? সে কি?" তিনি বল্লেন, "না, ওটা আমি জগন্নাথ দেবকে দান করেছি।" বিলক্ষণ! তবে তার পরিবর্ত্তে আর কিছু নিন্? তিনি বল্লেন, "তবে ঘন-আবর্ত্তন দুগ্ধ আছে কি?" গৃহস্থ বলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈ কি?" "তবে তা' খানিক দিতে পারেন।" দুধ দেওয়া হ'লে ভট্টাচার্য্য বল্লেন, "মর্ত্তমান রম্ভা কি আছে?" "হাঁ তাও আছে।" "উত্তম। উৎকৃষ্ট চিনি নাই কি?" আজ্ঞে হাঁ, উত্তম চিনি আছে।" দুধ চিনি ও রম্ভা পেয়ে ভট্টাচার্য্য বল্লেন, "বেশ বেশ, এ বেশ হলো! পায়েসের পরিবর্ত্তে ঠাকুরের এই প্রকারের সেবা হোলো!" একটা ঠোঁটকাটা লোক এই পংক্তিতে খেতে বসে-ছিল, সে বল্লে, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এযে পায়েসের চৌদ্দপুরুষ প্রস্তুত হ'লো। আপনি কি আপনার জগন্নাথের মুখে কেবল এক নুড়ো খড়ের জ্বাল দিয়ে এসেছিলেন? নৈলে সবই তো আপনার নিজের আছে দেখ্ছি! বরং জগন্নাথের কাছে রম্ভা প্রভৃতি কিছু সুদও ধ'রে নিচ্চেন।" ভট্টাচার্য্য একটু লজ্জিত হোলেন।

(৩)

বাড়াবাড়ি হিঁদুয়ানী।

কোন এক জন ভদ্র কায়স্থ একটু শুচিবেয়ে রকমের হিন্দু। তিনি নিজে কায়স্থ। কিন্তু তিনি শূদ্রের ছোঁয়া জল খেতেন না। এক দিন তিনি কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে তৃষ্ণা বোধ হওয়ায় ব'ল্লেন "মহাশয়, এক গেলাস জল চাই। বড় তৃষ্ণা বোধ হয়েচে।" গৃহস্থ চাকরকে হুকুম কল্লেন "ওরে শিগ্গের ক'রে এক গেলাস জল এনে দে ত।" তিনি বল্লেন "আজ্ঞে ঐটি হবে না, আমি নিজে শূদ্র বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল ভিন্ন শূদ্রের ছোঁয়া জল খাই না।" ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটি তখন নিজেই গিয়ে এক গেলাস জল এনে বল্লেন "হাঁ করুন, আমি মুখে ঢেলে নিই।" তিনি ব'ল্লেন "অত কর্ত্তে হবে না, হাতেই দিন।" ভদ্র লোকটি বল্লেন "বিলক্ষণ তাকি হয়? আপনার হাতে দিলেই তো শূদ্রের ছোঁয়া জল হোয়ে গেল, তা কেমন করে হবে? হাঁ করুন।"

(৪)

মাতালের ছুঁচো ধরা।

এক জন ভদ্রলোক মাতাল কলিকাতার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার দু পায়ের ফাকের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটা ছুঁচো চলে গেল। "যাবি কোথা ?" ব'লে মাতাল টলিতে টলিতে সেই ছুঁচোর পিছুনে দৌড়িতে আরম্ভ কল্লে। ছুঁচো গরীব প্রাণের দায়ে এক নর্দ্দমায় গিয়ে প'লো। মাতাল ও সেই নর্দ্দমায় প'ড়ে ছুঁচো হাতড়াচ্চে। এমন সময় একটি ভদ্রলোক মাতালের ঐ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হারা'ল মহাশয় ? ওকি খুঁজ্‌চেন ?" মাতাল ব'ল্লে—"একটা ছুঁচো গেল।" তিনি বল্লেন—"তা গেলই বা ?" মাতাল বল্লে—"তা নয়, পায়ের ভিতর দিয়ে গেল।" ভদ্র লোকটি বল্লেন—"তা নর্দ্দমায় তাকে হাঁতড়ালে কি হবে ? মাতাল বল্লে—"তা বটে, তুমি খুব ভদ্রলোক ? আজ পায়ের ভিতর দিয়ে ছুঁচোটা গেল, কাল বেড়ালটা যাক, তারপর দিন কুকুরটা যাক, ক্রমে লোকের গাড়ী ঘোড়া চলুক, আর অমনি করে পায়ে তল দিয়ে একটা রাস্তা পড়ে যাক। ও বাবা, এ ছুঁচো থেকে শাসন কত্তে হবে। হিসেব বোঝো ?"

(৫)

বর্দ্ধমান জেলার কাষ্ঠ কুড়ুম্বা গ্রামে নিবাস, উপাধি ঢোল, কোন একটি ভদ্রলোক কলিকাতায় গেছেন। তাঁর গ্রামের নাম ও উপাধিটুকু একটু বিশেষ রকমের, এই তাঁর অপরাধ। একদিন তিনি গোলদিঘির ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা ছেলের পাল্লায় পড়েছেন। ছেলেটা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লে "মহাশয়ের নাম ?"তিনি বল্লেন "আমার নাম শ্রীরামচন্দ্র ঢোল; আপনার কি নাম ?" ছেলেটা বল্লে, যে, "আমার নাম শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ঢাক।" আবার ছেলেটা জিজ্ঞাসা কচ্চে "আপনার নিবাস ?" তিনি বল্লেন "আমার নিবাস কাষ্ঠ কুড়ুম্বা। আপনার নিবাস ? আমার নিবাস "গদিঘিনি ধা।"

তিনি বল্লেন "ওতো বাজনার বোল ? আপনি বোধ করি ব্যাঙ্গ কর্‌চেন।" সে দক্ষিণ হস্তখানি সর্পবৎ বাঁকাইয়া ব'ল্লে "না, আমি এই সর্প কচ্চি। ভদ্র লোক বেচারা চুপ।

———

সঞ্চয়।

তিন সন্ন্যাসী।

"যখন প্রার্থনা করিবে তখন প্রার্থনার বাক্যগুলি পৌত্তলিকদের মত অকারণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিও না। পৌত্তলিকগণ বিবেচনা করে যে তাহারা যত জোরে প্রার্থনা উচ্চারণ করিবে ভগবান তত ভাল করিয়া শুনিতে পাইবেন।

তোমরা তাহদের মত হইও না। তোমার কি প্রয়োজন তাহা তোমর পিতা তুমি চাহিবার পূর্ব্ব হইতে জানেন।"

'আর্ক এঞ্জেল' নামক নগর নইতে এক খৃষ্টীয় পুরোহিত জাহাজে চড়িয়া 'সলোব্‌কি' নামক স্থানে গমন করিতেছেন। এই জাহাজে অনেকগুলি যাত্রী উঠিয়াছে, তাহারা সাধুদর্শনে যাইতেছে।

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জল যাত্রার পক্ষে বেশ অনুকূল, আকাশ পরিস্কার, সমুদ্র শান্ত। যাত্রীগণ একবার শুইতেছে, একবার খাবার খাইতেছে, এক একবার গোলযোগ করিয়া একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বসিতেছে, আর ক্রমাগত গল্প করিতেছে।

পুরোহিত ডেকের উপর আসিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। জাহাজের সম্মুখের দিকে গিয়া দেখেন তথায় অনেক লোক দলবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা পুরোহিতকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল।

পুরোহিত বলিলেন "ভ্রাতৃগণ! তোমরা গল্প হইতে বিরত হইতেছ কেন আমি তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

দলের মধ্য হইতে একজন বণিক উত্তর করিল "এই ধীবর কয়েকজন সন্ন্যাসার কথা বলিতেছিল।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে, বলনা, আমিও শুনি। এসব কথা শুনিতে আমি বড়ই ভাল বাসি; তোমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ও কি দেখাইতেছ?"

একজন খর্ব্বাকৃতি কৃষক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উত্তর করিল, "ঐ যে দূরে,

একটি ছোট দ্বীপ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। ঐ দ্বীপে তিনজন সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করিতেছেন।”

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ ছোট দ্বীপ?”

“এই যে, ঠিক আমার হাতের সোজা দৃষ্টিপাত করুন, ঐ দূরে একখান মেঘ দেখা যাইতেছে, উহার ঠিক বাম দিকে; এবার বোধহয় দেখিতে পাইতেছেন।”

পুরোহিত চাহিয়াই রহিলেন, সূর্য্যকিরণ নীলাম্বুবক্ষে ঝল্ ঝল্ করিয়া জ্বলিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাথায় মাথায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; তিনি চাহিয়াই রহিলেন, কিন্তু বিশেষ রকমের কোন কিছু দেখিতে পাইলেন না।

তিনি বলিলেন, “না আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আচ্ছা ঐ ছোট দ্বীপে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বাস করেন তাঁহারা কি প্রকারের লোক।”

কৃষক উত্তর করিল, “এই সাধু সন্ন্যাসী লোক আর কি? আমি বহুকাল হইতেই তাঁহাদের কথা শুনিয়া আসিতেছি, এতদিন তাঁহাদের দর্শন করার ভাগ্য হইয়া উঠে নাই, এই গত গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের চরণ-দর্শন করিয়া আসিয়াছি।”

ধীবর পুনরায় তাহার কথা বলিতে আরম্ভ করিল, কেমন করিয়া সে একদিন নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতে ধরিতে, বায়ুর তাড়নায় ঐ দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে সে এই দ্বীপটির কথা জানিত না, প্রাতঃকালে সে অজ্ঞাতপূর্ব্ব দ্বীপের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে একটি মাটির কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল একজন সন্ন্যাসী তথায় বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে আরও দুইজন সেই কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাহাকে খাওয়াইলেম, তাহার কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছিল, সে সমস্ত শুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তাহার পর তাহার নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেখানি সারাইতে তাহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিলেন।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁহারা কি প্রকারের লোক?”

“একজন ঈষৎ কুব্জ, খুব বেশী রকম বৃদ্ধ, গায়ে একটি অতি জীর্ণ বহির্বাস (Stole)। তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় একশত বৎসরেরও অধিক। শ্মশ্রু একেবারে শুভ্র। সকল সময়েই হাস্য করিতেছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল এমন প্রশান্ত ও উজ্জ্বল যে দেখিলে মনে হয় স্বর্গের দূত। দ্বিতীয় ব্যক্তি তদপেক্ষা

কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘকায়, মাথায় একটি ছিন্ন শিরস্ত্রাণ, শ্মশ্রু অর্দ্ধ শুভ্র, দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ। ইনি আমার নৌকাখানি টানিয়া জল হইতে তীরে তুলিয়াছিলেন। ইনি বেশ কৌতুকপ্রিয় লোক। তৃতীয় সাধু খুব উন্নত দেহ, আজানুলম্বিত শ্মশ্রু চন্দ্রের মত শুভ্র; অত্যন্ত বিমর্ষ, বক্র ভ্রুযুগলের মধ্যে চক্ষু দুইটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ইনি একেবারে উলঙ্গ, কোমরে কেবল একটি লোহার কটিবন্ধ আছে।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা তোমায় কি বলিলেন ?"

"তাঁহারা আমার যাহা প্রয়োজন সমস্ত কার্য্যই করিলেন, কিন্তু বিশেষ কথা কিছু বলেন নাই, এমন কি তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ও বড় একটা কথাবার্ত্তা কহেন না। একজন আর একজনের মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহারা কে কি বলিতেছেন পরস্পর বুঝিতে পারেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনারা কি এখানে অনেকদিন হইতে বাস করিতেছেন ?" আমার কথায় তিনি আমার প্রতি ভ্রূকুটি করিলেন, অস্পষ্টভাবে কি যেন বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল এইটুকু বুঝিলাম যে তিনি রুষ্ট হইয়াছেন। তখন সেই খর্ব্বাকৃতি সাধু তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, দীর্ঘাকৃতি সাধু আর কিছু বলিলেন না। বৃদ্ধ সাধু আমাকে বলিলেন, "আমাদের মার্জ্জনা কর।', এই বলিয়া তিনি অল্প হাস্য করিলেন।

কৃষক যখন এই সমস্ত ব র্ণনা করিতেছিল, তখন সেই জাহাজখানি ক্রমশঃ ঐ দ্বীপটির নিকট হইতে নিকটতর প্রদেশ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

বণিক পুরোহিতকে সসম্ভ্রমে বলিল, "এইবার আপনি চাহিলেই সমস্ত পরিস্কার দেখিতে পাইবেন।"

পুরোহিত বণিকের অঙ্গুলি নির্দ্দেশমত দৃষ্টিপাত করিলেন, অতি অস্পষ্টভাবে দ্বীপটির কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ রেখামাত্র তাঁহার নয়নগোচর হইল।

পুরোহিত দীর্ঘকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। জাহাজের সম্মুখ দিক হইতে তিনি পশ্চাদ্দিকে গমন করিলেন ও কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ঐ যে দূরে দ্বীপ দেখা যাইতেছে, উহা কি তুমি জান ?"

"আমি যতটুকু জানি তাহাতে ঐ দ্বীপের কোনও বিশেষ নাম আছে বলিয়া মনে হয় না এই অঞ্চলে ঐ প্রকারের অনেকগুলিই দ্বীপ আছে।"

"আচ্ছা, ওখানে যে সব বলাবলি করিতেছে যে, ঐ দ্বীপে তিনজন সাধু বাস করেন, তাহা কি সত্য ?

"হাঁ, লোকেত তাহাই বলিয়া থাকে, তবে আমি নিশ্চিতরূপে কিছুই জানি না। লোকে বলে যে ধীবরেরা তাঁহাদের দেখিয়াছে। তা' লোকে কিনা বলে ?"

"আমার ঐ দ্বীপে অবতরণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে ?"

"জাহাজে চড়িয়া ওখানে যাওয়া অসম্ভব। তবে আপনি কাপ্তানকে বলিয়া নৌকা লইয়া যাইতে পারেন। কাপ্তানকে বলুন।"

পুরোহিত কাপ্তানকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে ঐ দ্বীপে যাইয়া সাধুদের দেখিতেই হইবে। এখন আমার দ্বীপে যাইবার ব্যবস্থা কর।"

কাপ্তান পুরোহিতকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিল, বলিল—

"ইহা অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব ; ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর আমি খুব জোর করিয়া বলিতে পারি ঐ সন্ন্যাসীরা আপনাদের মত লোকের দেখিবার যোগ্যই নহে। আমি লোক মুখে শুনিয়াছি ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরা একটি একটি বিরাট গর্দ্দভ, কিছুই বুঝে না, কিছুই বলিতে পারে না, একরকম সমুদ্রের মাছ বলিলেও চলে।"

পুরোহিত বলিলেন—"তাহা হউক। আমাকে যাইতেই হইবে। তোমাদের যে ক্ষতি হইবে সেজন্য আমি টাকা দিব, আমার ঐ দ্বীপে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

আর কোন কথা নাই। নাবিকেরা ব্যবস্থা করিতে লাগিল। জাহাজের মোড় ফিরিল, তাহা দ্বীপের অভিমুখে চলিল। পুরোহিত জাহাজের সম্মুখে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিলেন। জাহাজের সমস্ত লোক সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল, সকলেই দ্বীপটির প্রতি চাহিয়া রহিল। যাঁহাদের দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ, তাহারা দ্বীপের পাহাড় দেখিতেছে, মাঝে মাঝে বলিতেছে "ঐ যে সন্ন্যাসীদের কুটীরও দেখা যাইতেছে।" একজন এমন কি সন্ন্যাসী তিনজনকেও দেখিতে পাইল। কাপ্তান একটি দূরদর্শন যন্ত্র বাহির করিল, তাহার সাহায্য

নিজে একবার দেখিয়া পুরোহিতের হস্তে তাহা প্রদান করিল ও বলিল "ঠিকৃত ; এই দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর তিনজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পুরোহিত ও সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন। যন্ত্র বেশ ঠিক করিয়া দেখিতে পাইলেন ঠিক তিনজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একজন খুব দীর্ঘকায়, দ্বিতীয় অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব. তৃতীয় অত্যন্ত খর্ব্ব। তাহারা সমুদ্রের তীরে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কাপ্তান পুরোহিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "জাহাজ ত আর অগ্রসর হইতে পারিবে না, আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আপনি নৌকায় করিয়া দ্বীপে যাইতে পারেন, আমরা নোঙ্গর করিয়া এইখানে জাহাজ লইয়া থাকিব।

পুরোহিত নৌকায় চড়িলেন, নৌকা অত্যন্ত বেগে চলিল। শীঘ্রই তিনি নৌকা হইতে সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি তিনি প্রায় উলঙ্গ, কটিতে লৌহ নির্ম্মিত কটিবন্ধ, যিনি খর্ব্ব তাঁহার মস্তকে ছিন্ন শিরস্ত্রাণ, আর যিনি খর্ব্বাকৃতি, বৃদ্ধ ও কুব্জ তাঁহার গাত্রে প্রাচীন বহির্বাস ; তাঁহারা হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

নৌকা তীরে লাগিল, পুরোহিত অবতরণ করিলেন। সন্ন্যাসীরা পুরোহিতকে দেখিয়া সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন, পুরোহিত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহারা মস্তক আরও নত করিয়া অভিবাদন করিলেন।

তদনন্তর পুরোহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন :—

"আমি শুনিলাম আপনারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এখানে রহিয়াছেন, আপনারা মুক্তির সাধনা করিতেছেন। আপনারা প্রভু খ্রীষ্টের উপাসক। আপনারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি প্রভু খ্রীষ্টের একজন অকৃতী ভৃত্য, তাঁহার সেবকগণের রক্ষারভার আমার উপর ও ন্যস্ত হইয়াছে। এই জন্যই আমি আপনাদের কিছু উপদেশ দিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসীরা কোনও রূপ উত্তর দিলেন না, ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিলেন।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা আপনারা কি উপায়ে মুক্তির

ধনা করিতেছেন? আপনারা কি প্রকারে ভগবানের আরাধনা করিয়া কেন?"

মধ্যমাকৃতি সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা াচীন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী ভ্রূকুটি করিলেন ও াচীনের প্রতি চাহিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিলেন ও বলিলেন :—

"আপনি ভগবানের সেবক; আমরা আরাধনার নিয়ম জানি না; আমরা জেদেরই সেবা করি, কোন প্রকারে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া থাকি।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা আপনারা কি বলিয়া প্রার্থনা রেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমরা এই বলি "আপনারা তিনজন, আমাদের তনজনকে কৃপা করুন।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যেমন এই কথাটি বলিয়াছেন অমনি অপর দুই জন আকাশের কে চাহিয়া তাঁহার প্রার্থনা বাক্যের সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিলেন।

পুরোহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এ যে ভগবানের ত্রিতত্ত্ব (Trinity) ম্বন্ধের কথা। এ প্রকারে প্রার্থনা করিবেন না। আপনারা ঈশ্বরের পাসক, আপনাদের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা আমার মনে বড়ই প্রবলভাবে াগিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতে পাইতেছি যে ভগবানকে তুষ্ট করিবার ন্য আপনাদের মনে বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে, কিন্তু সেই ভগবানের নিকট কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আপনাদের জানা নাই। আপনারা এ কারে প্রার্থনা করিবেন না, আমার কথা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগকে শিখাইতেছি। আমি আমার নিজের কথা শিখাইব না। ভগবানেরই ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবান যেরূপ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন তাহাই আপনাদের শিখাইব।"

এই বলিয়া পুরোহিত সন্ন্যাসীদিগকে ভগবান কি প্রকারে মানবগণের নিকট প্রকট হইয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ঈশ্বর পিতারূপ, ঈশ্বর পুত্ররূপ ও ঈশ্বর পবিত্রাত্মা রূপ এই তত্ত্বের অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "পুত্ররূপ ঈশ্বর" মানবের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকারে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।

অতঃপর পুরোহিত ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের শিখাইতে লাগিলেন। তিনি একটি করিয়া কথা বলেন আর সন্ন্যাসীরা তিনজনে তাহা আবৃত্তি করেন এই প্রকারে একটি একটি করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। মধ্যমাকৃতি সন্ন্যাসী কয়েকটি কথা শিখিবার পর সে গুলি আর যথাযথ ভাবে বলিতে পারেন না, দীর্ঘাকৃতি উলঙ্গ সন্ন্যাসী উচ্চারণই করিতে পারেন না, বৃদ্ধ ও তদ্রূপ।

পুরোহিত তথায় বসিলেন, কতবার যে শিখাইলেন তাহার সংখ্যা নাই; এই ভাবে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত প্রার্থনা বাক্য শিখাইলেন। মধ্যমাকৃতি সন্ন্যাসী প্রথম শিখিলেন, অন্য দুই জন তাহার পর শিখিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। পুরোহিত নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীগণ মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখচুম্বন করিলেন ও তিনি যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন সেই ভাবে প্রার্থনা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

পুরোহিত যখন নৌকায় চড়িয়া জাহাজে ফিরিতেছিলেন, তখন শুনিতে পাইতেছিলেন যে সন্ন্যাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেছেন।

পুরোহিত জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে আর সন্ন' দিগের কণ্ঠস্বর শুনা যায় না। তবু ও জাহাজের লোকেরা চন্দ্রকিরণে ছেন, দ্বীপের উপর সন্ন্যাসী তিনজনকে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইতেছি দক। তাঁহারা সমুদ্রতীরে ঠিক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যিনি সর্ব্বাপে - খর্ব্ব তিনি মধ্যে, তাঁহার দক্ষিণ দিকে দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী আর বামদিকে যিনি মধ্যমাকৃতি তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

জাহাজের নোঙ্গর উঠিল, পাইল উত্তোলিত হইল, জাহাজ চলিল।

পুরোহিত জাহাজের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটির প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রথম প্রথম সন্ন্যাসীদিগকে দেখা যাইতেছিল, তাহার পর আর দেখা যায় না, কেবল দ্বীপটিই দেখা যাইতেছে। তাহার পর

টিও দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। এখন চারি দিকে সমুদ্রের জলরাশি, চন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে।

যাত্রীগণ নিদ্রামগ্ন, জাহাজের ডেকের উপর সমস্তই নিস্তব্ধ। পুরোহিতের। নাই, তিনি জাহাজের পশ্চাদ্দিকে বসিয়া সেই দ্বীপটি যে দিকে সেই দিকে য়া রহিয়াছেন, সেই সরল হৃদয় সন্ন্যাসীদিগের কথা তাঁহার মনের মধ্যে গিয়া উঠিতেছে।

পুরোহিত ভাবিতেছেন, সন্ন্যাসীগণ এই প্রার্থনা বাক্য শিক্ষা করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছেন, ভাবিতেছেন এই সন্ন্যাসীগণকে ঈশ্বরের বাক্য শিখাইয়া তিনি সন্ন্যাসী দিগের বিশেষ কার করিয়াছেন, অগ্ন তাঁহার দ্বারা ভগবানের একটি খুব মহৎকার্য্য সিদ্ধ য়াছে।

এই প্রকারে পুরোহিত বসিয়া আছেন, এই প্রকারে ভাবিতেছেন ও সেই পটির প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু তরঙ্গের মাথায় থায় নৃত্যশীল রজত-শুভ্র কোমল শশি করে ভরিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ নি দেখিতে পাইলেন, সমুদ্রবক্ষে প্রতিবিম্বিত উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের উপর দিয়া জ্বল ও শ্বেতবর্ণ একটী পদার্থ উড়িয়া অথবা ভাসিয়া আসিতেছে। ইহা কি? রোহিত একাগ্র চিত্তে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় একখানি ছোট নৌকা আমাদের জাহাজ ধরিবার জন্য দ্রুত বেগে আসিতেছে। এখনও বহুদূর-প্রব দেখিতে দেখিতে নিকটস্থ হইল, যাহা হউক একটা কিছু যে আমাদের ণ করিতেছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

পুরোহিত নির্ণয় করিতে পারিলেন না জিনিসটা কি—নৌকা কি অন্য কিছু, পাখী কি অন্য কিছু, মাছ কি অন্য কিছু। এ যে মানুষের মত, তাই ত, কিন্তু খুব প্রকাণ্ড মানুষ। না মানুষ সমুদ্রের জলের উপর দিয়া কি প্রকারে আসিবে?

পুরোহিত গাত্রোত্থান করিয়া কর্ণধারের নিকট গমন করিলেন।

পুরোহিত কর্ণধারকে বলিলেন, "দেখ, ওটা কি বলিতে পার? কি বল দেখি?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি নিজেও দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন সেই সন্ন্যাসী তিনজন, জলের উপর দিয়া, দৌড়াইয়া আসিতেছেন।

তাঁহাদের শুভ্র শ্মশ্রুজাল চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা দ্রুতভাবে আসিতেছেন।

কর্ণধারও দেখিল, সন্ন্যাসীরা ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাহার হস্ত হইতে হাল খসিয়া গেল। সে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ যে সেই সন্ন্যাসী তিনজন জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন।"

জাহাজের সমস্ত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল ও জাহাজের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া সম্মিলিত হইল। সকলেই দেখিল সেই সন্ন্যাসী তিনজন হাত ধরাধরি করিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন। সন্ন্যাসীগণ অনতি বিলম্বে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন ও তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"পুরোহিত মহাশয়! আমরা সে প্রার্থনা বাক্য ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি যখন শিখাইতেছিলেন তখন বেশ মনে হইতেছিল, তাহার পর এক ঘণ্টা স্মরণ করি নাই। এখন দেখিতেছি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি আবার আমাদের সেই প্রার্থনা-বাক্য শিখাইয়া দিন।"

পুরোহিত ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া সন্ন্যাসীগণকে অভিবাদন করিলেন ও বলিলেন :—

"আপনারা যাহাই বলিয়া প্রার্থনা করুন না কেন, ভগবান তাহাই শ্রবণ করেন। আমি আপনাদের কোন শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নহি। আমরা পাপী, আপনারাই আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুন।"

এই বলিয়া পুরোহিত সন্ন্যাসীদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীগণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন ও পুনরায় পূর্ব্বের মত সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সন্ন্যাসীগণ জাহাজের যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের পদস্পর্শে সেই স্থান ঝল ঝল করিয়া জ্বলিতেছে।*

শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

* কাউণ্ট টলষ্টয় হইতে গৃহীত

তাঁহাদের শুভ্র শ্মশ্রুজাল চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা দ্রুতভাবে আসিতেছেন।

কর্ণধারও দেখিল, সন্ন্যাসীরা ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাহার হস্ত হইতে হাল খসিয়া গেল। সে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ যে সেই সন্ন্যাসী তিনজন জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন।"

জাহাজের সমস্ত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল ও জাহাজের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া সম্মিলিত হইল। সকলেই দেখিল সেই সন্ন্যাসী তিনজন হাত ধরাধরি করিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন। সন্ন্যাসীগণ অনতি বিলম্বে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন ও তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"পুরোহিত মহাশয়! আমরা সে প্রার্থনা বাক্য ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি যখন শিখাইতেছিলেন তখন বেশ মনে হইতেছিল, তাহার পর এক ঘণ্টা স্মরণ করি নাই। এখন দেখিতেছি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি আবার আমাদের সেই প্রার্থনা-বাক্য শিখাইয়া দিন।"

পুরোহিত ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া সন্ন্যাসীগণকে অভিবাদন করিলেন ও বলিলেন :—

"আপনারা যাহাই বলিয়া প্রার্থনা করুন না কেন, ভগবান তাহাই শ্রবণ করেন। আমি আপনাদের কোন শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নহি। আমরা পাপী, আপনারাই আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুন।"

এই বলিয়া পুরোহিত সন্ন্যাসীদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীগণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন ও পুনরায় পূর্ব্বের মত সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সন্ন্যাসীগণ জাহাজের যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের পদস্পর্শে সেই স্থান ঝল ঝল করিয়া জ্বলিতেছে।*

শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

* কাউণ্ট টলষ্টয় হইতে গৃহীত

পরলোকে মানুষ।

ভূত, ভূতুড়ে বাড়ী, মরা মানুষের সঙ্গে দেখা, এই সব ব্যাপারের গল্প, সকল দেশে, সকল সময়েই প্রচলিত আছে। সেকালের অধিকাংশ লোকই এ সমস্ত বিশ্বাস করিত, এখনও অনেক লোকে করে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এই সমস্ত কথা মিথ্যা বলিয়া অনেকেরই মনে ধারণা হইতেছিল, অনেকেই ভাবিতেছিলেন যে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে, মানুষের মধ্যে এ সমস্ত অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বিশ্বাসও ততই কমিয়া যাইবে, শেষে একেবারেই থাকিবে না।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে যে, ফল বোধ হয় ঠিক তাহার বিপরীত দাঁড়াইবে। এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংখ্যা এত বেশী, যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাহার তত্ত্বান্বেষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে Psychical Research Society নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা বাঙ্গালায় এই সমিতিকে "মনস্তত্ত্ব গবেষণা সমিতি" বলিতে পারি। বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক এই সমিতিতে সংশ্লিষ্ট হইলেন। এই সমস্ত মনীষি অলৌকিক ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আলোচনা দ্বারা যে সব তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত সত্য, একবিন্দুও অতিরঞ্জন তাহার মধ্যে নাই, ইহা বেশ অকুতোভয়ে ধরিয়া লইতে পারা যায়। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক হেন্‌রি শিজ্‌উইক্, প্রথমে এই সমিতির সভাপতি ছিলেন, তাহার পর ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী রাইট্ অনারেবল এ জে ব্যালফোর, সার উইলিয়ম, ক্রুক্‌শ, অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ফ্রেডারিক্, ডব্লিউ, এইচ, মায়ার্স, সার অলিভার, লজ্, অধ্যাপক ডব্লিউ, এফ, ব্যারেট্, অধ্যাপক চার্লস্ রিচেট্, রাইট্ অনারেবল জেরাল্‌ড্ ব্যালফোর, শ্রীমতী হেন্‌রী সিজ্‌উইক্ পর পর ইহার সভাপতি হয়েন। এই সমস্ত মনীষিগণের নাম ও সভার অন্যান্য সদস্যগণের নাম এবং তাঁহারা যেরূপ তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত গবেষণা করেন তাহা চিন্তা করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত সংশয়শীল ব্যক্তিকেও এই সমিতির মন্তব্য শ্রদ্ধান্বিতভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

ডিসেম্বর মাসের Modern Review পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার Ph. D. মহাশয় এই সমিতি সম্বন্ধে ও পরলোকে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে দু একটী কথা গ্রহণ করিতেছি।

'টেলিপ্যাথি' লইয়া এই সমিতি প্রথম আলোচনা করেন। একজন লোকের মনে একটা ভাবনা হইতেছে, আর একটী লোক তাহার মনের দ্বারা ঠিক সেই ভাবনা জানিতে পারিতেছে, বাহিরে কোন প্রকাশ নাই, অথচ মনের ভিতরে ভিতরে এই যে জানাজানি বা ভাবের গতায়াত ইহাকেই ইংরাজীতে 'টেলিপ্যাথি' বলে। এই ব্যাপার লইয়া অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ফলে দেখা গিয়াছে যে একজন লোককে 'মুগ্ধ' (hypnotise) করিয়া, অথবা তাহার সহজ অবস্থায়, তাহার মনের মধ্যে অন্য একজন লোক তাহার চিন্তা বা কল্পনা জাগরিত করিয়া দিতে পারে। এই সমিতির বিবরণীতে যাহা আছে তাহার অনুবাদ এইরূপ।

"এই সমস্ত পরীক্ষাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কতকগুলিতে যিনি ভাব চালাইতে চাহেন অর্থাৎ ভাবপ্রেরক; যাহাকে তদ্ভাবে ভাবিত করিতে চাহেন অর্থাৎ ভাব গ্রাহকের সমক্ষে নিজেকে দেখা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যে সময় চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময়ে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরে ভাবগ্রাহক তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি ঘটনায় ভাবপ্রেরক চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে গ্রাহক তাঁহার কথা চিন্তা করুন, ফলে গ্রাহক তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তৃতীয়তঃ এমন একটী সুপরীক্ষিত ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে একজন প্রেরক একই সময়ে দুইজন লোকের সমক্ষে অপর এক চতুর্থ ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।"

অবশ্য এই সময়ে ভাবগ্রাহক ও ভাব প্রেরকের মধ্যে অনেক দূরতার ব্যবধান ছিল।

এই গেল পরীক্ষার কথা অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া উৎপাদিত চিন্তা সংক্রমণ বা টেলিপ্যাথির কথা। আপনা হইতে এই প্রকারের যে সমস্ত ঘটনা ঘটে সেই প্রকারের অসংখ্য প্রামাণিক ঘটনাও এই সমিতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। দুজন লোকের মধ্যে অনেক ব্যবধান, মধ্যে মহাসমুদ্র রহিয়াছে, অথচ একজনের যখন মৃত্যু হইল অথবা কোন একটা বিশেষ রকমের বিপদ ঘটিল, তখন আর

একজনের মনে তাহার সংবাদ জাগিয়া উঠিল। এ প্রকার ঘটনা কেন ঘটে তাহা নিরূপণ করিবার ভার এক বিশেষ কমিটির হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা আলোচনার পর স্থির করিলেন, ইহা অবিশ্বাস করার কোন উপায় নাই। ইহার অসম্ভাবনা যদি হয় এক, তাহা হইলে সম্ভাবনা ৪৪০; সুতরাং তর্ক শাস্ত্রানুসারে ইহা সত্য বলিয়াই গ্রহণীয়। এই প্রকারের অনেক ঘটনাই আছে।

জেমস্ লয়ড্ লিখিতেছেন, "আমি ভারতবর্ষে সৈনিকের কাজ করিতাম। এক দিন রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম আমার বাবা বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি বলিল "জিম্, বিদায় হই, আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।" একমাস পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম ঠিক সেই দিন সেই সময়ে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমি স্বপ্ন দেখার পর তারিখটি ঘরের দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার পাশের ঘরে যে বন্ধু শুইতেন। সকালে উঠিয়া তাঁহাকেও স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলাম। এই ঘটনা যখন হয় তখন জেমসের বয়স ২৭ বৎসর, শরীর বেশ সুস্থ, তাহার পিতার জন্য কোনরূপ উদ্বেগ তাহার মনে ছিল না।"

ওয়াকার এণ্ডারসন্ লিখিতেছেন, "১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে আমি অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলাম। ইংলণ্ডে আমার এক আত্মীয়ার মৃত্যু হয়, আমি অষ্ট্রেলিয়ায় বসিয়া মৃত্যুর সময়েই তাহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাই। ছায়ামূর্ত্তি দেখার তারিখ ও সময় খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। চিঠিতে মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মিলাইয়া দেখিলাম ঠিক মিলিয়া গেল।"

রেভারেণ্ড, ম্যাথু ফ্রষ্ট লিখিতেছেন, "১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বৃহস্পতিবারে জানালার দিকে পিছন রাখিয়া চা খাইতেছি আর স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেছি এমন সময় পরিষ্কার শুনিলাম, কে যেন জানালায় নাড়া দিল, আমি পিছনে চাহিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, আমার পিতামহী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার সাতদিন পরে খবর পাইলাম ইয়র্কসায়ারে আমার পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে সময়ে ছায়ামূর্ত্তি দেখি তাহার ঠিক একঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

আবার ফ্রষ্টের স্ত্রী এই ঘটনা যে সত্য সে সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়াছেন। এই প্রকারের অসংখ্য ঘটনা তাহাদের সত্যতার সবিশেষ প্রমাণসহ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে মানুষ যখন মরে তখন তাহার দেহ

হইতে কোন একটা কিছু বাহির হয় এবং তাহাই দূরস্থ আত্মীয় বন্ধুকে দেখা দেয়। অবশ্য যে কোন দুইজন লোকের মধ্যে চিন্তা সংক্রমণ হয় না।

এই গেল মৃতমনুষ্যের ছায়ামূর্ত্তি-দর্শন। আবার জীবিত মনুষ্যের ছায়ামূর্ত্তি দর্শনেরও অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। কুমারী এ, ই, আর, লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে বাস করিতেছি। আমার ভগ্নি ও আমি, ভগ্নিপতির ফিরিয়া আসার জন্য বড়ই ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার ভগ্নিপতি সকাল বেলায় জরিপের কাজ করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, বিকাল হইতে হইতেই তাঁহার ফিরিয়া আসার কথা। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম প্রায় ২০০ গজ দূরে ভগ্নিপতি তাঁহার ছোট টম্‌টম্ গাড়ী চড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেই ধূসর রঙ্গের ঘোড়া ও গাড়ীর পিছনে তাঁহার সেই সহিসকে আমরা উভয়েই পরিষ্কার দেখিলাম। উভয়েই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, "এই যে তিনি আসিতেছেন।" আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরিয়া একজন চাকরকে তাঁহার স্নানের জল ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলাম, বাবুর্চ্চিকে তাঁহার জন্য খানা প্রস্তুত করিতে বলিলাম। এদিকে আমার ভগ্নিপতির মা'ও খুব ভাবিতেছিলেন আমরা গিয়া তাঁহাকেও তাঁহার পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ বলিয়া আসিলাম। তাহার পর সময় কাটিয়া যায়, তিনি আর ফেরেন না, আমাদের বড়ই ভাবনা হইতে লাগিল। তাহার অনেক পরে রাত্রি আটটার সময় তিনি আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমরা ২০০গজ দূরে তাঁহাকে যে সময় দেখিয়াছিলাম, তিনি সে সময়ে জরিপের জায়গা হইতে সবেমাত্র বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটে তখন আমরা উভয়েই সুস্থদেহ ও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত ছিলাম।"

মুমূর্ষু ও জীবিত ব্যক্তির ছায়া দর্শন ব্যতীত অনেক সময়ে বহুদিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে এপ্রকারের লোক কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবিত ব্যক্তিকে দেখা দিয়া থাকেন। লর্ড ব্রুহাম্ তাঁহার বন্ধুগণের সহিত সুইডেনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, তিনি তাহা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"নরওয়ে যাইবার জন্য আমরা গটেনবর্গ হইতে যাত্রা করিলাম, রাত্রি এক-

টার সময় একটি সুন্দর অতিথিশালায় উপনীত হইয়া সেই খানেই রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলাম। সমস্ত দিন রাত্রি হিম লাগিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি গরমজলে স্নান করি মনে করিতেছি। এই সময়ে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। তাহা বলিতে হইলে দুচারিটি গোড়ার কথা বলা দরকার।

উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জি'র সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; আমরা দুই বন্ধুতে যখন বেড়াইতে যাইতাম সেই সময়ে আমাদের আত্মার অমরত্ব, মৃত্যুর পরের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইত। মরা মানুষ ভূত হইয়া বেড়াইয়া বেড়ায় কিনা এই সব লইয়া আমাদের প্রায়ই আলোচনা হইত। একদিন আমরা নিজে-দের শরীরের রক্ত বাহির করিয়া তাহার দ্বারা এক দলিল লিখিলাম যে আমাদের মধ্যে যে আগে মরিবে, সে আসিয়া অপরকে দেখা দিয়া পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়া যাইবে। কলেজের পড়া শুনা শেষ হওয়ার পর, বন্ধুবর জি, সিভিলসার্ভিসে চাকরি লইয়া ভারতবর্ষে চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বড় একটা চিঠি লেখালেখি ছিল না, কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি তাহার কথা প্রায়ই ভুলিয়া গেলাম। জি'র কোন আত্মীয় স্বজন ও এডিনবরায় থাকে না, সুতরাং তাঁহার বিষয় আলোচনা করিবার আর কোন প্রয়োজন হয় নাই। ফলে আমি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একেবারে ভুলিলাম।

আজ আমি গরমজলে গা ডুবাইয়া বেশ আরামে বসিয়া আছি। এমন সময়ে আমি যে চেয়ারে আমার কাপড় জামা ছাড়িয়া রাখিয়াছিলাম চাহিয়া দেখি সেই চেয়ারের উপর জি' বসিয়া রহিয়াছে। সে নীরবে আমার দিকে চাহিয়া। আমি ত একেবারে অবাক, একরূপ জ্ঞান শূন্য বলিলে ও হয়। আমি কেমন করিয়া টেবিল হইতে উঠিলাম তাহা আমার মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি মেজেতে শুইয়া আছি। জি'র ছায়া মূর্ত্তি চলিয়া গিয়াছে।"

লর্ড ব্রুহাম, যে সময়ে ইহা দেখেন তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ভারতবর্ষের পত্রে জি'র মৃত্যু সংবাদ পাইলেন, মিলাইয়া দেখিলেন,

তিনি যে সময়ে ছায়া মূর্ত্তি দেখেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জি'র মৃত্যু হয়।"

একটি ঘটনা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। অধ্যাপক সিজ্-উইক্ স্বয়ং তদন্ত করিয়া বিশেষভাবে এই ঘটনাটির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঘটনাটি এই :—

কুমারী ডড্সন্ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিতেছেন, "১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন রবিবার, রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ জাগিয়া শুনিলাম কে আমার নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিল। আমি মনে করিলাম 'কাকা'। জাগিয়া বলিলাম "কাকা! এস ঘরে এস।" তৃতীয়বার আবার ডাকিল, এবার গলার আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম এ'ত কাকা নয়, এ যে আমার মা। আজ ১৬ বৎসর হইল মা'র মৃত্যু হইয়াছে। আমি উত্তর করিলাম "মা!" তখন মা অথবা মা'র ছায়ামূর্ত্তি এক-খানি পর্দা ঘুরিয়া আমার বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার কোলে দুইটি ছেলে। মা ছেলে দুটিকে আমার কোলে দিয়া বলিল "লুসি! প্রতিজ্ঞা কর, এই ছেলে দুটিকে পালন করিবে! বল, ইহাদের মা নাই এইমাত্র মারা গিয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ মা! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহাদের পালন করিব।"

"আবার বল প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

"হাঁ প্রতিজ্ঞা করিতেছি—"

তাহার পর আমি বলিলাম "মা, আমি বড় দুঃখে আছি, একটু দাড়াও আরও গোটা কতক কথা কও।"

মা বলিল "না, না, আর কিছু বলিব না।" এই বলিয়া পর্দাখানি ঘুরিয়া মা চলিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল যেন ছেলে দুটি তখনও আমার কোলে আছে, এই অবস্থায় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন আমি জাগিলাম তখন দেখিলাম কোথাও কিছু নাই। ৭ই জুন তারিখে অর্থাৎ ইহার ঠিক দুদিন পরে আমি খবর পাইলাম যে আমার ভাইয়ের স্ত্রী মারা গিয়াছে। তাহার একটি নূতন ছেলে হইয়াছে, সে খবরও পাইলাম, ইহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না।"

'মায়ার্স'এর নাম অনেকেই অবগত আছেন। Human personality and its survival of bodily death নামক গ্রন্থ এখন বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঐ সমিতির বিবরণী হইতে 'মায়ার্স'এর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঘটনাটি 'মায়ার্স'এর নিজের। তিনি বলিতেছেন :—

"১৮৬৭ খৃঃ অব্দে আমার একমাত্র ভগ্নি ১৮ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। আমি ভগ্নিটিকে বড়ই ভাল বাসিতাম। সেণ্টলুই নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার এক বৎসর পরে আমি এক ব্যবসায় সম্পর্কে চাকুরী গ্রহণ করি, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আমি পশ্চিমাঞ্চলে নিজের কাজের অনুরোধে ঘুরিতেছি সেই সময়ে এই ঘটনাটি ঘটে।

সেণ্টলুই সহরের কাজ সারিয়া হোটেলে মনের সুখে বসিয়া আছি. ব্যবসায়ের কথা ভাবিতেছি। বেলা দুপুর বাজিয়া গিয়াছে। চুরুট খাইতে খাইতে হঠাৎ মনে হইল কে যেন আমার বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম আমার সেই ভগ্নি, খুব ভাল করিয়া দেখিলাম. মনে কোনই সন্দেহ রহিল না, ঠিকই আমার ভগ্নি। আমি আনন্দে অধীর হইয়া যেমন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছি অমনি মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

পরের ট্রেণেই বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাবার কাছে ও মার কাছে সমস্ত কথা বলিলাম। বাবা ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম যে ভগ্নির শরীরে একটা নূতন জিনিস দেখিলাম, দেখিলাম তাহার ডান গালে একটা ভয়ানক লাল আঁচড় রহিয়াছে, সেটা কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার এই কথা শুনিয়া মা একেবারে আকুল হইয়া উঠিলেন, চোকের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভগ্নিকে দেখিয়াছ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার ডান গালের এই লাল আঁচড়ের কথা আমি ছাড়া জগতের আর কেহই জানে না। সে মরিয়া যাওয়ার পর আমি তার কোনও কল্যাণকর কাজ করিতে যাইয়া দৈব-যোগে তাহার মৃতদেহে এই ক্ষত ঘটাইয়া দিয়াছিলাম। তখন আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছিল। ভাবিলাম আহা বাছার মৃতদেহ বেদনাযুক্ত করিলাম। পাছে অন্য কেহ দেখিতে পায় বলিয়া আমি 'পাউডার' দিয়া বেশ ভাল করিয়া

তাহা চাকিয়া দিয়াছিলাম। তুমি যখন সে আল বার দেখিয়াছ, তখন নিশ্চয় তুমি তাহাকে দেখিয়াছ।"

পূর্ব্বের ঘটনাবলী "টেলিপ্যাথি"র নিয়মে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিস্তর গবেষণ চলিতেছে। প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে উহা একপ্রকার উন্নত ও সাধারণ ভাবের 'টেলিপ্যাথি' বা চিন্তা সংক্রমণ; দুইটি আত্মার সাযুজ্য ও পরস্পরাগত আকর্ষণই এই চিন্তা সংক্রমণের ভিত্তি। প্রার্থনা করিলে যে ফল হয় তাহার কারণও এই চিন্তা সংক্রমণ। একটি মন সাক্ষাৎভাবে অপর একটি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। প্রার্থনার ফল ফলে বলিলে বুঝিতে হইবে যে অশরীরি জীবগণের মন শরীরি জীবগণের মনে শান্তির প্রবাহ প্রেরণ করে।

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ।

প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা।

সাবিত্রী। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, বি,এ, প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। বই খানি বেশ ছাপা, কাগজ, কেমন পরিপাটি,—ছবিগুলি কেমন সুন্দর! বই খানি হাতে ধরিলে বাস্তবিক খুব আনন্দ হয়। পাঁচ খানি রঙিন ছবি, সুন্দর মলাট ও রেশমী ফিতায় বাঁধা বইটির ছ আনা দাম সস্তার চুড়ান্ত।

সুখের ও আশ্বাসের কথা এই যে বই খানি কেবল বাইরে চক্‌চকে নয়। সাবিত্রীর উপাখ্যানটি এমন সোজা কথায় মিষ্টি বাঙ্গলায় পুরুষ মানুষে গুছিয়ে লিখ্‌তে পারে, এ ধারণা আমাদের ছিল না। ব্রত কথা, ছড়া, কাহিনী প্রভৃতি আমাদেরই সামগ্রী। আমরা দু আখর লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখেছি, আর উপন্যাস ও কবিতায় ডুবে আছি; আর পুরুষ মানুষে আমাদের অবহেলার ধন কুড়িয়ে নিয়ে বাহবা নিচ্ছে দেখ্‌লে অন্ততঃ বাঙ্গালী মেয়ে মানুষদের হিংসা হওয় উচিত। আমাদের ও হয়েছে—'বীরভূমি'তে সেটা জাহির কর্‌লেই কার্ত্তিক বাবুকে যথোচিত পুরস্কৃত করা হবে, মনে করি।

শ্রীমতী——

বীরভূম।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। "বীরভূমি" বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র।

২। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

৩। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহা মাসিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়।

৪। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৫। প্রবন্ধাদি পত্রিকা সম্পাদকের নামে ও টাকা কড়ি বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

৬। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট না পাঠাইলে ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা প্রবন্ধ গৃহীত হয় না।

শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল।
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ, সিউড়ি, বীরভূম।

দেবালয়।

(দেবালয়-সমিতির নিজস্ব একখানি চৌতল বাটী আছে।)

উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা ও দান-ধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয় সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার আছে।

দেবালয়ের উদ্দেশ্যের সহিত যাহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন, বার্ষিক চাঁদা ১৲।

দেবালয় হইতে "দেবালয়" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ইহার নিয়মিত লেখক। দেবালয় সমিতির সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে এই পত্রিকাখানি পাইয়া থাকেন।

দেবালয় সভ্যপদ [illegible] ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেবালয় কর্ম্মকর্ত্তাকে পত্র লিখিবেন। দেবালয় কার্য্যালয়—২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সূচীপত্র।

(১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩১৭)

দুই খানি নূতন গ্রন্থ।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, প্রণীত।

১। নবযুগের সাধনা।

এযুগের যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহাই আলোচ্য। যাবতীয় সংবাদপত্রে অতি উচ্চ ভাষায় প্রশংসিত। মূল্য ॥০

২। শ্রীগুরুচরণে

বেদান্তের উপদেশ এরূপ সরল ভাষায় পূর্ব্বে কখন লিখিত হয় নাই; স্ত্রীলোকে ও বুঝিতে পারিবেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ। মূল্য ।৵০

৫০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরীতে [illegible]।

(নবপর্য্যায়)

১ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩১৭ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

নিবেদন।

সুদূরবর্ত্তী অজ্ঞাত পল্লীর নিভৃত কুটিরে বসিয়া একজন সাধক সনাতন সত্যের একটি বিশেষ রকমের প্রকাশ বিদ্যুৎবিকাশের মত মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই ভাগ্যবান্ সাধক হয়ত ভাবিলেন ইহা সেই অনাদি তত্ত্বের প্রকাশ, অথবা ভাবিলেন ইহা আমার নিজের চিন্তার ফল। তিনি যাহাই মনে করুন না কেন, সেই প্রকাশটুকুকে তিনি নিজের মধ্যে কিছুতেই লুকাইয়া রাখিতে পারিবেন না, সেই দর্শনের সহিত বিতরণ করিবার এমন একটা সুপ্রবল আবেগ নিত্যকাল বিদ্যমান যে, তাঁহার সাধ্য নাই তিনি তাহা লুকাইয়া রাখেন। হয়ত সঙ্গীতে কিম্বা কবিতায়, ভাস্কর্য্যে কিম্বা চিত্রে, উপন্যাসে অথবা মৌখিক উপদেশে সেই চিন্তা বাহির হইয়া পড়িল। আকাশের বৃষ্টি নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত হওয়ার পর যেমন একদিন বাহির হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ। সামান্য জলধারা, অতি ক্ষীণ—ইহা আর কতদূর যাইবে? কেহই তাহার প্রতি ভুলিয়াও সম্ভ্রমের সহিত দৃষ্টিপাত করে না।

[illegible] কথা আছে। যিনি জ্ঞানী, ভবিষ্যৎ যিনি বুঝিতে পারেন, এই বিশ্বে স[illegible]বিনশ্বর এই তত্ত্বের সহিত যাঁহার যথার্থ পরিচয় হইয়াছে—তিনি দেখেন

এই ক্ষীণ জলধারার মন্থরগতির পুরোদেশে বিশাল তরঙ্গিনী বীচিমালা বিক্ষোভিত হইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে—বহ্বায়ত ভূভাগ তাহার করুণ স্পর্শে ফলশস্যে সুশোভিত হইয়া শত শত জনপদের স্বাস্থ্য, শান্তি ও শোভা সম্পাদন করিতেছে।—শুধু তাহাই নহে তিনি ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুর অপূর্ব্ব মহিমাও মানসপটে অঙ্কিত করিতেছেন। আমাদেরও এই ক্ষুদ্র জলধারা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে—কাহারও উপেক্ষা, কাহারও আশীর্ব্বাদ, কাহারও ঘৃণা কাহারও আদর—ইহার বক্ষে পতিত হইতেছে। যে বিধাতা বিশ্বের ভবিষ্যৎ গড়িতেছেন—জানিনা তিনি ইহার জন্য কি বিধান করিতেছেন!

আপনি, আমি, অন্যান্য মানব—অতি ক্ষুদ্র, অতি দীন—মৃত্যুময় সংসারে বিবিধ বিপত্তির দ্বারা নিত্য বিতাড়িত হইয়া মলিন বদনে বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, মৃত্যুকে ছাড়াইয়া, এই বিপত্তিপুঞ্জকে ছাড়াইয়া—এই মাটির জগৎকে ছাড়াইয়া, আমরা ভাবিতেছি—আমাদের এই ভাবনার মধ্যে যেগুলি এই জগতের, সেগুলিকে ছাড়িয়া দিন, সেগুলি একান্ত ভাবেই আমাদের নিজস্ব—কিন্তু সকলগুলিতো তাহা নহে—অনেকগুলি,—যে সব ছাড়াইয়া, সকলের ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিতেছে—আমাদের এই ভাবনাগুলিই সেই নারায়ণ—সেই সনাতন সত্যের প্রকাশ—যিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের এই নরত্ব সম্ভাবিত করিয়া আমাদের নরনারায়ণ করিতেছেন।

ভাবনাপুঞ্জের মধ্যে যেটুকু এই ক্ষুদ্র, সসীম ও ইন্দ্রিয়বদ্ধ আমিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটুকু চলিয়া যাউক—কিন্তু আমার মধ্যে এই যে নারায়ণের লীলাটুকু—এটুকুকে ধরিতে হইবে, রাখিতে হইবে—বিশ্বের এটুকু চাই, এ লীলাঃ সমূহকে ধরিয়া অনন্তকালের অনন্ত মানবজাতির জন্য রাখিতে হইবে, ইহা যে তাহাদের সম্পত্তি—এটুকু যদি ধরিতে না পারি, রাখিতে না পারি তাহা হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

মানবের মধ্যে নারায়ণের এই যে প্রকাশ—এই যে বিচিত্র ও অনন্ত লীলা—সাহিত্য তাহাই সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তির যেমন ভগবানের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তেমনি সাহিত্যের প্রতি সকলেরই একটা কর্ত্তব্য আছে।

আমি ক্ষুদ্র মানব—অতি নগণ্য, আমার চিন্তায় জগতের কি হইবে? আমার চিন্তায় জগতের কিছু না হইতে পারে—কিন্তু আমার চিন্তার যেগুলি কেবল আমার নহে—পরন্তু সকল জগতের, সেটুক পাইতে জগতের অধিকার আছে—

জগত যেন তাহা পাইতে বঞ্চিত না হয়। সেই জন্যই দল বাঁধিতে হইবে, সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে হইবে।

এই যে আমাদের জ্ঞান-'সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী,' হৃদয়-'সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট' নারায়ণ—তাঁহার মধ্য দিয়াই আমরা পরকে আত্মীয় করিতেছি, সুদূরবর্ত্তীকে নিকট করিতেছি, অতীতকে বর্ত্তমান করিতেছি। বেদান্ত মতে 'নারায়ণ' বলিতে সূত্রান্তর্য্যামী বিরাটকে বুঝায়—আমাদের এই সাহিত্য-সাধনা, ইহা সমবেত ভাবে সেই নারায়ণেরই উপাসনা।

আমরা সেই বিরাটকে পাইতে চাই—নিখিল বিশ্বের প্রাণের মধ্যে যিনি রহিয়াছেন—কবির কল্পনা, দার্শনিকের গবেষণা, ঐতিহাসিকের ইতিহাস যাঁহাকে খুঁজিতেছে। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে আমরা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র 'বীরভূমি'র মধ্য দিয়া সেই বিরাট নারায়ণকেই খুঁজিতে চলিয়াছি। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন পারসিক-ইহুদি, কাহারও নিজের নহেন, তিনি সকলের—তিনি নিখিলের। আমরা সকলেই নিজ নিজ ভাবের মধ্য দিয়া তাঁহাকেই খুঁজিতেছি।

আজ পাঁচ মাস হইল আমরা নিভৃত গিরিকন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছি, যখন বাহির হই, তখন অনেকেই বলিয়াছিলেন মরুভূমির মধ্য দিয়া পথ, আমাদের এই অতি ক্ষীণ সাধন-প্রবাহ অচিরেই শুকাইয়া যাইবে। কি হইবে জানিনা, কিন্তু আমরা এখনও শুকাইয়া যাই নাই—প্রত্যহই নূতন নূতন জলধারা আমাদের সহিত মিশিতেছে বটে, কিছু কিছু পুষ্টিও হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—পথ বড়ই বিঘ্ন-সঙ্কুল। যে সমস্ত দিক হইতে শক্তি সঞ্চার হইবে ভাবিতেছিলাম, সে সমস্ত দিক হইতে বড় একটা কিছু আসিতেছে না, যাঁহারা অবগাহন করিবেন, উল্লাসে সন্তরণ করিবেন বলিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই নীরব, নূতন নূতন যাত্রী আসিতেছেন সত্য—কিন্তু উৎসমুখে যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহারা আজ কোথায়? তাঁহাদের আগ্রহ উদ্যম কই? তাঁহাদের যে চাই!

বীরভূমের ন্যায় একটি জেলা হইতে 'বীরভূমি'র ন্যায় একখানি মাসিকপত্র বাহির করিতে সক্ষম হওয়া অত্যন্ত সহজ কথা। না পারাই লজ্জার কথা, পারিলে বিশেষ কিছু প্রশংসা নাই। এই মাসিকপত্র যখন কাহারও সম্পত্তি নহে, ইহা হইতে কেহ যখন আর্থিক লাভের প্রত্যাশী নহেন, তখন ইহা কেন স্থায়ী হইবে না?

সাহিত্য-সাধনা জিনিসটা কি, এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, ইহা যিনি বুঝিবেন তিনি একার্য্যে নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। আমরা চাই এই 'বীরভূমি'র মধ্যে মিলিত হইয়া বিস্তৃততর সাহিত্যিক জীবনের সহিত জীবন্ত যোগ-রজ্জুতে বদ্ধ হইতে। এই আকাঙ্ক্ষা, ইহা একটা হুজুগ নহে—একটা সৌখীনতা নহে—যেমন ডাল ভাত ও পানীয় জলের প্রয়োজন—না হইলেই চলে না;—যাঁহারা যথার্থ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন—নব্যভারতে যে জ্ঞানালোক আসিয়াছে সৌভাগ্যবশে তাহা হইতে যাঁহারা বঞ্চিত হন নাই—তাঁহারা নিজেদের জিজ্ঞাসা করুন, সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই প্রকারের একটা বিস্তৃততর জীবন প্রবাহের মধ্যে নিজেকে লইয়া আসা তাঁহাদের একটা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে কিনা? যাঁহাদের তাহা প্রয়োজন হইয়াছে, ইহার অভাব বুঝিবার মত বিকাশ যাঁহাদের হইয়াছে—আমরা তাঁহাদেরই সহায়তা ও সহানুভূতির প্রত্যাশা করি। তাঁহারা আমাদের গ্রহণ করুন, আমাদের আত্মীয় হউন, আমাদের বন্ধু হউন—আমাদের উৎসাহিত করুন। তাঁহাদের উৎসাহ-বাণীই আমাদের পরমার্থ, তাঁহাদের আনুকূল্যের মধ্যেই বিশ্বদেব আমাদের জন্য বসিয়া রহিয়াছেন, এই হৃদয় ও সাধনগত সামঞ্জস্যের মধ্যেই আমরা সেই পরম পুরুষের আশীর্ব্বাদ-অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাহির হইয়াছি।

মহাত্মা টলষ্টয়।

(৩)

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পর প্রথম যৌবনে টলষ্টয়এর ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল তাহাও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বপ্রণীত 'আত্মকথা" (Confession) নামক গ্রন্থে তাঁহার সেই সময়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"আনুষ্ঠানিক খৃষ্টীয় মতে আমি দীক্ষিত ও শৈশবাবধি শিক্ষিত হইয়াছিলাম। কি অতি শৈশবে, কি বাল্যে, কি প্রথম যৌবনে সকল সময়েই আমাকে এই ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করার দ্বিতীয় বৎসরে, যখন আমার বয়স আঠার বৎসর মাত্র, তখন হইতে আমি আর সেই সমস্ত উপদিষ্ট মতে আদৌ বিশ্বাস করিতাম না।"

এই প্রকারে তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি

তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি প্রায়ই খুব আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করিতেন। আসল কথা এই যে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্ম্মের রুশ-গ্রীসীয় সম্প্রদায়ের মত যদিও বিচার ও তর্কের দ্বারা তিনি অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তবুও দুঃখ ও নিরাশার সময় তিনি আপনা হইতেই—সংস্কারের বশবর্ত্তিতায়—ভগবানের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমত বেশ স্থৈর্য্য ও পরিপক্কতা লাভ করে নাই—এই সময়ে সর্ব্বদাই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইত। তিনি স্বকীয় 'আত্মকথা' (Confession) নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"শৈশবে যে ধর্ম্মমত শিখিয়াছিলাম তাহা চলিয়া গেল। পনর বৎসর হইতে যখন দার্শনিক গ্রন্থাদি পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন আগেকার ধর্ম্মমত যে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক তাহা বেশ সজ্ঞানভাবে বুঝিলাম। যখন ষোল বৎসর বয়স তখন স্বেচ্ছাক্রমে উপাসনা মন্দিরে যাওয়া ও উপবাস করা বন্ধ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিতাম না সত্য, কিন্তু একটা কিছুতে বিশ্বাস. করিতাম। আমি কিসে যে বিশ্বাস করি তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বেশ স্পষ্টভাবে আমার বিশ্বাসের বস্তু নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না বটে, তথাপি একটা কিছুতে যে বিশ্বাস করিতাম তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতাম, অথবা ঈশ্বর যে নাই এমন কথা কদাচ মনে করিতাম না। তবে ঈশ্বর কেমন, কোথায় আছেন, তাঁহার লক্ষণ কি, এ সমস্ত কিছুই জানিতাম না। খ্রীষ্ট ও তাঁহার উপদেশও আমি অস্বীকার করিতাম না—তবে তাঁহার উপদেশ কি, তাহাও ঠিক জানিতাম না।

"এখন যদি আমি জীবনের সেই অংশের বিষয় চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, জীবনের পূর্ণাঙ্গ-বিকাশ সাধন করিতে হইবে, এরূপ করা প্রয়োজন, ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস আমার জীবনের মূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ-বিকাশ জিনিসটা কি, এবং কি জন্যই বা ইহার প্রয়োজন তাহা আমি জানিতাম না। আমি আমার বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ-বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম—যাহা কিছু পাইতাম নিবিষ্টভাবে তাহাই পড়িতাম। আমি আমার ইচ্ছাশক্তির পূর্ণাঙ্গ-বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম—ভাবিয়া ভাবিয়া নিয়ম প্রণয়ন করিতে লাগিলাম, যেমন করিয়া পারি এই সমস্ত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। আমি আমার শরীরের পূর্ণাঙ্গ-বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম—আমার শারীরিক বল ও সামর্থ্য যাহাতে

বৃদ্ধি পায় তজ্জন্ত ব্যায়াম করিতাম—আহার বিশ্রাম প্রভৃতির অভাবের সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আমি মনে করিতাম যে এই প্রকারেই আমার জীবনের পূর্ণাঙ্গ-বিকাশ হইবে। অবশ্য এই প্রকারে বৃত্তিপুঞ্জের অনুশীলনের প্রথম কথা নৈতিক চরিত্রের বিকাশ—প্রথমে কেবল নৈতিক চরিত্রের বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতাম। ক্রমশঃ মনে হইল যে কেবল মাত্র নৈতিক বৃত্তির বিকাশই যথেষ্ট নহে, সাধারণ ভাবে পূর্ণতালাভের প্রয়োজন। অবশ্য সে সময়ে এমন মনে হইত না যে নিজের চক্ষে অথবা ভগবানের চক্ষে পূর্ণতা লাভ করিব ; তখন মনে হইত অন্য লোকের চক্ষে পূর্ণতা লাভ করিব। ক্রমশঃ অন্য লোক অপেক্ষা সকল বিষয়ে বড় ও বিখ্যাত ও বৈভবশালী হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল।”

টলষ্টয়ের যৌবনের অবস্থা বুঝিতে হইলে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাঁহার সময়ে তাঁহাদের সমাজে যুবকগণের পক্ষে ব্যাভিচার এত স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত যে তাহাকে কেহ বিশেষভাবে দূষণীয় বলিয়া মনে করিত না। সুতরাং গণিকা গৃহে গমন করিতে তাঁহাদের মনে কোনরূপ অন্যায় হইতেছে এরূপ চিন্তাই হইত না। যাহা হউক ক্রমশঃ তিনি নিজের জন্য নিম্নরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমরা তাঁহার নিজেরই উক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি ;—

“এখন হইতে রমণী-সমাজের সহিত মেশা সমাজ জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী অসুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিব। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, দুর্ব্বলতা, তরলচিত্ততা প্রভৃতি বিবিধ পাপ আমাদের জীবনকে কলুষিত করে। সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, যুক্তিশীলতা, ন্যায় পরতন্ত্রতা প্রভৃতি গুণ স্ত্রী সমাজের সংসর্গে আমরা হারাইয়া থাকি। ভাব গ্রহণের শক্তি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক। কাজেই পুণ্যের যুগে স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা ভাল ছিল। কিন্তু এই অধঃপতিত যুগে স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা খারাপ হইয়াছে।” *

লিও টলষ্টয়ের মধ্যম ভ্রাতার ডাকনাম ‘মিত্রি’। ইনি বড় অদ্ভুত প্রকৃতির

---

* আমরা এই অংশের ইংরাজী অনুবাদও প্রদান করিলাম, যাঁহারা প্রাচ্য জগতের এ বিষয়ে সতর্কতার হেতু লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন ;—

“To regard the society of women as a necessary unpleasantness of social life and to keep away from them as much as possible. From whom indeed do we get sensuality, effiminacy, and frivolity in everything and man's other vices, if not from women? Whose fault is it, if not women's, that we lose our innate qualites of boldness, resolution, reasonableness, justice etc.,? Women are more receptive than men, therefore in virtuous ages women were better than we ; but in the present depraved and vicious age they are worse than we are.”

লোক ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তাঁহারা একত্রে থাকিতেন। লিও টলষ্টয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার তৎকালীন জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"আমার মধ্যম ভ্রাতা কিছু বেশী রকমের ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। হঠাৎ থাকিতে থাকিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার এই ধর্ম্মানুরাগ আসিয়া পড়িত। তখন তিনি খুব ঘন ঘন উপাসনা-মন্দিরে যাইতেন এবং সমস্ত উপাসনা ও আরাধনায় যোগ দিতেন। সে সময়ে তিনি খুব উপবাস করিতেন, এবং একেবারে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে দিন কাটাইতেন। আমাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, তাঁহারাও দাদাকে খুব বিদ্রূপ করিতেন। একদিন আমাদের কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়ীতে আমাদের এক নাচের নিমন্ত্রণ ছিল। আমার মধ্যম ভ্রাতা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। অধ্যাপক তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন যে অতি ধার্ম্মিক রাজা দায়ুদও নাচে যোগ দিতেন। অধ্যাপকের এই কথায় আমার মনে এই বিশ্বাস হইল যে, উপাসনা মন্দিরে যাওয়া ও ধর্ম্মপুস্তক (Catechism) পড়া খুবই দরকার হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া এই সমস্তকে সর্ব্বস্ব করিয়া জীবনের আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।" (Confession)

লিও টলষ্টয়ের এই অদ্ভুত-প্রকৃতিসম্পন্ন মধ্যম ভ্রাতার জীবনের অবশিষ্ট ঘটনাবলীও লিও টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"তাঁহার নাম ছিল ডিমেট্রিয়াস্। অন্যান্য যুবকেরা যখন আমোদ প্রমোদে যুবতীগণের সমাজে ও বিবিধ ব্যাভিচারে দিন যাপন করিত তিনি সে সময়ে কাহারও সহিত মিশিতেন না, লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, তাহা গ্রাহ্য করিতেন না, তামাক, সিগারেট, মদ প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করিতেন না। সময়ে সময়ে কেবল খুব রাগিয়া উঠিতেন, অন্য সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। আমরা সকলে বড় লোকের ছেলেদের সহিত বন্ধুতা করিতাম, তাহাদের সঙ্গে নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া দিন কাটাইতাম। তিনি এক দরিদ্র, ছিন্ন-বস্ত্র যুবকের সহিত খুব মিশিতেন তাহার সহিতই তাঁহার বন্ধুতা ছিল। তিনি বেশ অনায়াসে সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। যাহা হউক আমরা বাড়ীর সকলে সেই মধ্যম ভ্রাতাকে ঘৃণা করিতাম ; বলিতাম, তোমার রুচি বড় নীচ, ছোটলোকের সঙ্গেই তুমি মিশিতে ভাল বাস ; পিসিমাও ঠিক্ এইরূপ কথা বলি-

"আমাদের ভ্রাতাগণের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেলে এই মধ্যম ভ্রাতা 'যাসনয় পলিয়ানা'র পল্লী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ে দাস (Serfs) দিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি সর্ব্বপ্রথম বুঝিলেন ও প্রচার করিলেন যে, দাসগণের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনকল্পে যে জমিদার নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় না করেন, তিনি মহাপাপী। দাসগণের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—রুশিয়া দেশে জমিদারদিগের মধ্যে এই কর্ত্তব্যের বোধ এই প্রথম।

"ইহার পর তাঁহার মনে হইল যে কি প্রকারে তিনি দেশের হিতসাধনে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে আইন প্রণয়ন ব্যাপারের মধ্যে যদি তিনি কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা দেশবাসিগণের হিত হইতে পারে। তদনুসারে তিনি রাজ-ধানী পিটার্স্বর্গে গমন করিলেন; অনেক বড়লোককেই জিজ্ঞাসা করিলেন 'এমন কি কার্য্য আমি করিতে পারি যাহার দ্বারা দেশের যথার্থ হিত সাধিত হইতে পারে?' তিনি যাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা রুষদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দেশের হিতসাধন করা যে একটা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য, এই বৃত্তি যে মানবাত্মার একটা স্বাভাবিকী ও অনিমিত্তা বৃত্তি, আমরা কেবল বহুশতাব্দীব্যাপী কুশিক্ষা, কুআদর্শের অনুবর্ত্তনে স্বার্থপর হইয়া কেবলমাত্র ব্যক্তি-গত বা পরিবারগত সুখ স্বচ্ছন্দতার অন্বেষণে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছি। দেশের সেবার জন্য, সাধুব্যক্তির প্রাণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিতে পারে, এ কথা ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের কখনই মনে হয় নাই এবং এমন প্রশ্নও পূর্ব্বে কেহ তাঁহাদের করে নাই। সুতরাং তাঁহার এই নূতন ধরণের প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরিশেষে তিনি এই উপদেশের জন্য এক বন্ধুর শরণাপন্ন হইলেন, তিনি বলিলেন 'দেখ তুমি রাজসরকারে চাকুরি করিয়া দেশের হিত করিতে চাও, কিন্তু তাহা পারিবে না, তোমার যদি কিছু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ইহাতে তাহারই পরিতৃপ্তি হইবে।' এ প্রকারের কথা পূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে বলে নাই। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বন্ধুর কথাই যথার্থ। তিনি একেবারে নিরাশ হইলেন; জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট, আশ্রয়শূন্য ও আনন্দবিহীন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় রাজধানী হইতে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। শূন্য, সমস্তই শূন্য—অসাড় জীবন উপযোগিতাহীন, সাধু-সঙ্কল্প অন্তরে উঠিয়া অন্তরেই মিলাইয়া গেল—তাহারা আর এ জীবনে সফল হইবে না!

"দেশে ফিরিয়া তাঁহার জীবন পূর্ব্বের মতই কাটিতে লাগিল, সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গতায়াত করিত এবং তিনি এই প্রকারের লোকের সহিত মিশিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই ভাবে যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার জীবনে এক ভীষণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তাঁহার এক অসৎ প্রকৃতির বন্ধু জুটিল, তাহার সহিত মিশিয়া অল্প অল্প মদ খাইতে লাগিলেন, ক্রমশঃ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিতে ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। 'মাসা' নাম্নী এক গণিকাকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিলেন। এই ভাবে পাপাচরণের মধ্যে থাকিতে থাকিতে তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া মস্কো হইতে দেশে ফিরিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। এই প্রকারে উপযুক্ত কার্য্যের অভাবে এক প্রতিভাশালী মহৎ জীবনের শেষ হইল।"

যাহা হউক, আমরা লিও 'টলষ্টয়'এরই জীবনী বর্ণনা করি।

চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে লিও টলষ্টয় যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন তন্মধ্যে ইংরাজী প্রসিদ্ধ লেখক ডিকেন্সের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিকেন্‌সের বিখ্যাত মত বিশেষ ভাবেই আলোচ্য। যাঁহারা ডিকেন্সের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ডিকেন্স পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যাবলীর উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তথায় যে সমস্ত বক্তৃতা হয় ও কার্য্যাদি হয়, তাহাকে "Formal piling of words" বলিতেন। কেবল 'কথার' পরে কথা'।

টলষ্টয়ের অন্তর্জীবন গঠনে, ডিকেন্সের প্রভাব অপেক্ষাও ফরাসী লেখক বিখ্যাত 'রুশো' (Rousseau)র প্রভাব অধিক। এই লেখক সম্বন্ধে টলষ্টয় স্বয়ং বলিয়াছেন—

"I have read the whole of Rousseau—all his twenty volumes including his Dictionary of Music. I was more than enthusiastic about him, I worshipped him. At the age of fifteen I wore a medallion portrait of him next my body instead of the Orthodox Cross. Most of his pages are so akin to me that it seems to me that I must have written them myself."

"আমি রুশো'র সমস্ত গ্রন্থ—তাঁহার কুড়ি খণ্ড গ্রন্থই পড়িয়াছি। এমন কি তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ক অভিধানও আমি পড়িয়াছি। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমি কত আনন্দিত হইতাম, তাহা আর কি বলিব। আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম

বলিলেও হয়। আমার বয়স যখন পনর বৎসর তখন একটী মুদ্রার উপর মুদ্রিত তাঁহার মূর্ত্তি আমি ক্রুশের পরিবর্ত্তে আমার বুকে ঝুলাইয়া রাখিতাম। তাঁহার রচনা আমার এতই মনের মত যে আমি তাহা নিজেই যেন লিখিয়াছি, বলিয়া মনে হইত।"

ফরাসী দেশীয় গ্রন্থকার ভল্‌টেয়ারের রচনাবলীও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি যখনই যে গ্রন্থ পড়িতেন অলসভাবে পড়িতেন না, গভীর ভাবে ও আত্যন্তিক অধিবেশনের সহিত পাঠ করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "ললিত কলা কি?" (What Is Art?) নামক একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এমন কি ১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেও যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় সম্বন্ধে তিনি এই গ্রন্থে যেরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কাল; 'টলষ্টয়'এর বয়ঃক্রম তখনও উনিশ বৎসর হয় নাই। সেই সময়ে তিনি 'যাসনয়'এর পল্লী ভবনে তাঁহার স্নেহময়ী পিসিমা টাটিয়ানার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে চারিটি উদ্দেশ্য ছিল, অনুশীলনের দ্বারা নিজের উন্নতিবিধান, ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করা, বিষয় সম্পত্তির সুব্যবস্থা করা আর দাসদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই যে চতুর্থ কার্য্য অর্থাৎ তাঁহার দাস বা প্রজাবৃন্দের অবস্থার উন্নতি সাধন, এ কার্য্যে তিনি বিশেষ কিছু সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। মহাত্মা টলষ্টয় তৎপ্রণীত এক গ্রন্থে (A Squire's Morning) তাঁহার এই সময়ের চেষ্টা ও সেই চেষ্টার বিফলতার হেতু অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতে সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের ফলে এই সমস্ত নির্ব্বাক, জ্ঞানহীন ও কুসংস্কারান্ধ প্রজাপুঞ্জের যে বিভীষিকাময় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য জমিদারই ভগবানের নিকট দায়ী ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। *

---

* পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের কয়েকটি ছত্র এইরূপ।

"Is it not my plain and sacred duty to care for the welfare of these seven hundred people for whom I must account to God? Will it not be a sin if, following plans of pleasure or ambition, I abandon them to the caprice of coarse elders or stewards? And why should I seek in any other sphere opportunities of being useful and doing good, when I have before me such a noble, brilliant and intimate duty?"

টলষ্টয়ের এই মহৎ চেষ্টা কেনই বা সফলতা লাভ করিল না, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা তাহারও হেতু নিরূপণ করিতে পারি। প্রথমতঃ জমিদার ও ভদ্রলোক টলষ্টয়, কলেজের লেখা পড়া শিখিয়া যখন তাহাদের উন্নতি সাধনকল্পে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন তখন তাহাদের বিশ্বাসই হইল না যে এক জন জমিদার সত্য সত্যই তাহাদের হিত কামনা করিতে পারে। কারণ এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও এরূপ চেষ্টা করে নাই। তাহাদের মনে সন্দেহ হইল, তাহারা ভাবিল বোধ হয় এই প্রকারে আমাদের উপকার করিবে, এই ছল করিয়া আমাদের আরও সর্ব্বনাশ করিবে।

কাজান হইতে 'যাস্‌নায়' গিয়া টলষ্টয় কিছু দিন তথায় রহিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকালে তিনি রাজধানী পিটার্সবর্গে গমন করিলেন। পর বৎসরের প্রারম্ভেই তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতে তাঁহার তৎকালীন জীবনের অনেক ঘটনাই বুঝিতে পারা যাইবে। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

"আমি পিটার্সবর্গ হইতে এই পত্র লিখিতেছি। আমি মনে করিতেছি যে চিরকালই রাজধানীতে থাকিব। উপস্থিত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে চাই, তাহার পর চাকুরী গ্রহণ করিব।

"আসল কথা এই যে পিটার্সবর্গে বাস করা বেশ সুখের। আমার জীবনে এই স্থানের প্রভাব বেশ সুফল উৎপাদন করিতেছে। আমি বেশ কর্ম্মশীল হইয়া উঠিতেছি। এখানে কেহই অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সকলেই দিন রাত্রি ব্যস্ত, সকলেই কাজ করিতেছে। এখানে এমন একজন লোকও দেখাইতে পারিবে না, যে উদ্দেশ্যহীন অলস জীবন যাপন করিতেছে।

"তুমি হয়ত আমাকে একটা নিতান্ত অসাড় ও বুদ্ধিহীন ভাবিয়া মনে মনে উপহাস করিতেছ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমার চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমার জীবন এখন একটা নূতন আদর্শের অভিমুখে গড়িয়া উঠিতেছে।

"এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে কেবল মাত্র উচ্চ চিন্তা করিয়া জীবন ধারণ করা যায় না—একটা কর্ম্মময় বাস্তব জীবন ধারণ করাই প্রয়োজন।

সুতরাং আমার অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ প্রকারের অবস্থা আমার জীবনে এই নূতন। যদি কোনও উদ্যমশীল যুবক জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে রুশিয়া দেশের মধ্যে পিটার্সবর্গই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।"

১লা মে তারিখে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে আর একখানি পত্র লেখেন;—অবশ্য এই পত্রের সুর পূর্ব্বোক্ত পত্রের সুর হইতে বিভিন্ন।

"তুমি অবশ্যই মনে করিতেছ যে আমি অত্যন্ত অসাড়। বাস্তবিকই তাই! আমি যে কি করিয়াছি তাহা ভগবানই জানেন! আমি যে কেন পিটার্সবর্গে আসিয়াছিলাম, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—এখানে আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত কাজের মত কাজ কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, কাজের মধ্যে কেবল অকারণ অজস্র টাকা খরচ করিয়াছি: এখন দেনার দায়ে বিব্রত। হায় আমি কি ভয়ানক মূর্খ! এখন আমার যে কিরূপ মনস্তাপ হইতেছে তাহা আর তোমাকে কি বলিব! এখন কথা এই যে এই সমস্ত দেনা অবিলম্বেই শোধ করিতে হইবে, যদি শীঘ্র শোধ করিতে না পারি, তবে টাকা ত তাহারা আদায় করিবেই, অধিকন্তু আমার সম্মানটুকুও সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি আমার কথায় খুব রাগিয়া উঠিবে। কিন্তু এখন উপায় কি? এরকমের ভুল মানুষ জীবনের মধ্যে কেবল একবারই করে। এখানে আসিয়া আমি একেবারে স্বাধীন হইয়া পড়িলাম, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল বড় বড় কল্পনা করিতে লাগিলাম, সেইজন্যই আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখন দয়া করিয়া এই দেনার হস্ত হইতে যাহাতে আমার অব্যাহতি ঘটে শীঘ্র শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করিও; আমি একেবারে কপর্দ্দকশূন্য ও দেনায় বিব্রত জানিবে।"

যাহা হউক পিটার্সবর্গে থাকিবার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শেষ পরীক্ষা আর দিলেন না, তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের কথা। হাঙ্গেরী প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছে, তাহাই দমন করিবার জন্য রুশিয়ায় সৈন্য-সজ্জা হইতেছিল।

শেষে নানা কারণে তাঁহার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাও হইল না, আইনের তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি গ্রহণ করাও হইল না। তিনি রাজধানী হইতে এক সঙ্গীতাচার্য্য বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া 'যাসনয়'এর পল্লীভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৪৮ হইতে ১৮৫১ পর্য্যন্ত এই তিন বৎসর তিনি কখনও 'যাসনয়'এ, কখনও বা মস্কো নগরে থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের আদর্শগত কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। কখন কখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার মত ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতেন, আবার কিছুদিন যাইতে যাইতে সে প্রকারের নিবৃত্তিমূলক জীবন আর ভাল লাগিত না, তখন একেবারে ভোগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, খুব মদ খাইতেন, শিকার করিতেন, জুয়া খেলিতেন। ইহা ছাড়া আরও একটা উপসর্গ ছিল, তাঁহাদের দেশের একদল নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী স্ত্রীলোক দল বাঁধিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়;—তাহাদের দলে যথেচ্ছাচারী হইয়া কয়েক দিন বেড়াইতেন। তাঁহার জীবনের এই তিন বৎসর একেবারে উপযোগিতাবিহীনতার ফল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও তাঁহার আত্মসম্বরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, প্রথমেই নিজেকে তিরস্কার করিতেছেন, অনুতাপ করিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর এমন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিব না, বিশেষভাবে সংযমের সহিত নিজের উন্নতি বিধান করিব। সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কার্য্যের এক কঠোর তালিকা প্রণয়ণ করিলেন, কখন কি করিবেন সমস্তই স্থির হইয়া গেল। এই নিয়মে অবশ্য কিছুদিন চলিল, কিন্তু এ সংযম স্থায়ী হইল না, উদাস প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি আবার বিপথগামী হইলেন।

সাধারণ প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য তিনি এই সময়ে একটী বিদ্যালয়ও স্থাপনা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর ইহার কার্য্য কোনরূপে চলিল, কিন্তু শেষে অর্থাভাবে ইহা বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নানারূপ অমিতব্যয়িতার ফলে তাঁহার অর্থকষ্টও অত্যন্ত অধিক হইল।

লিও টলষ্টয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাস্ সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ককাশাস্ প্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ছুটি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার জীবনে আর এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

মহানদা।

"যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি
বন্ধবো মে—"
উত্তররামচরিতম্।

এ বিজনে দূরবাসে, সতত, হে স্রোতস্বিনি,
পড়ে তোমা মনে :—
তোমার ও মুক্তক্রোড়ে সুখ-সান্ধ্য বিচরণ
মৃদু সমীরণে,
কত হাসি গল্প গাঁন বিহার কৌতুক কত
কত ফুল্ল মুখ
কত স্নিগ্ধ অতীতের প্রীতি সুমধুর স্মৃতি
ভরে ক্ষুদ্র বুক!
তোমার সৈকত তীরে উপল খণ্ডের'পরে
বসি' মুগ্ধ চিত
মনে পড়ে কতদিন শুনেছি ও শ্রান্তিহীন
অস্ফুট সঙ্গীত!
হেরেছি ও ফুল্লহাসি আতট বিস্তৃত স্বচ্ছ
স্নিগ্ধ নীলিমায়
মিশিতেছে ধীরে, ধীরে, দূর সীমান্তের সনে
বঙ্কিম রেখায়!
পরপারে অতি ক্ষীণ নিবিড় অরণ্য রেখা
গোধূলি তিমিরে
আঁকে কৃষ্ণছায়া কত, ঘনাইয়া গাঢ়তর
তব স্বচ্ছ নীরে !
চিত্রিয়া তরঙ্গাকারে সায়াহ্নের স্বর্ণমাখা
নীলিম গগন,
শৈলশ্রেণী দূরে দূরে, শোভে গাঢ় নীলিমায়,
মোহিয়া নয়ন!

তোমার নির্ম্মল বুকে, চিত্রি স্বর্ণচ্ছবি মত,
ফুটে দীপ্তভাসে
অর্দ্ধ অস্তগত রবি— উদ্ধোৎক্ষিপ্ত করজাল
সায়াহ্ন আকাশে !
ধীরে সে অন্তিমজ্যোতিঃ তিমিরে মিলায়ে থাকে
আকাশের পটে —
বিলুপ্ত সিন্দূর শোভা ধীরে সন্ধ্যা-সুন্দরীর
মন্দির ললাটে !
ও পারে কানন ছায়ে দূর দিগন্তের গায়ে
ক্রমে মুছে আসে
সারি সারি ছবি আঁকা সুনীল গিরির রেখা
ধূসর আকাশে !
ছায়া আবরণে ধীরে ছেয়ে ফেলে নদী বুক
সায়াহ্ন তিমির,—
দূর হ'তে আসে মন্দ বহি সান্ধ্য ফুলবাস
সজল সমীর !
মনে পড়ে তার পর, গৃহে ফেরা কতদিন
অস্পষ্ট আঁধারে
নির্জ্জন প্রান্তর দিয়ে, ছায়া ঘন বনপথে
নদীর কিনারে !
উপরে রজনী-বধূ জ্বালে দীপ তারকার
আকাশ প্রাঙ্গণে,
তুলসী প্রদীপ হাতে বরে তায় কুলবধূ
শঙ্খধ্বনি সনে !
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর ক্রমে দূর নগরীর
কর্ম্মে কোলাহল,—
কভু শোনা যায় দূরে মাঝিদের সারিগান
উল্লাস চপল !
তার পর ধীরে শশী বিকাশি রজতকান্তি
শান্ত নীল নীরে

ছায়াঙ্কিত জ্যোছনায় ফুল্ল করি চারিদিক
উঠে বৃক্ষশিরে।
ভেদি দূর তরুরাজি মোদের কুটীর দীপ
দেখা যায় ধীরে,
মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণে, ফিরি মোরা গৃহপানে
নদী তীরে তীরে !
কতদিন কত রূপ, দেখেছি গো মা তোমার,
মুগ্ধ নেত্র ভরি
কত যে বিচিত্র লীলা, তরল কল্লোল ক্রীড়া,
অয়ি জলেশ্বরি !
ছেয়েছে আকাশ যবে, গোবিন্দের বর্ণচোর*
নব জলধর
পড়েছে মেঘের ছায়া তোমার শ্যামল বুকে
মলিন ধূসর,—
চপলার ঝিকিমিকি, সে আবিল জলস্রোতে
পিঙ্গল আভাস,
কি সুষমা অভিনব, খুলে দেয় অঙ্গে তব
সে গৈরিকবাস !
নিদাঘে সিকতালীন তোমারি মুরতি ক্ষীণ :—
নব বরষায়
শুভ্র ফেনপুষ্পে সাজ, পরিপূর্ণ যৌবনের
উচ্ছ্বাস বন্যায় !
বসন্ত প্রভাতে পরি' সিন্দূর বরণ বাস
উপান্ত প্রসূন
ধীরপদে মৃদু হাসি যাও তুমি পূজিবারে
প্রভাত অরুণ !

* "তস্যাদাতুং জলমবনতে শাঙ্গিণো বর্ণচৌরে"—মেঘদূতম্।

এ বিশ্ব আকুল যবে শরতের চন্দ্রিকায়
আনন্দ-চঞ্চল,
তুমি শান্ত নির্ব্বিকারা তোমার বৈধব্যবাস
পবিত্র ধবল !

আরো স্মরি কতদিন, তোমার স্নেহাঙ্কে বসি,
হে মাতৃরূপিনি,—
পরিপূর্ণ চারিধার বসন্তের জ্যোছনায়
দিগন্তব্যাপিনী !
যৌবনের আশানেত্রে কামনার তুলি দিয়ে
কত বিমোহন ৹
আঁকিয়াছি স্বপ্নরাজ্য প্রেমের অমরা কত
কত কি নন্দন !
হায়, এ হৃদয়-মঞ্চে কত লীলা অভিনয়
কল্পনা-বধূর,
হেরিয়াছি পূর্ণ প্রাণে কতদিন আত্মহারা—
ক্ষণ সুমধুর।

মাগো, আজ দূরদেশে, একা ব'সে দিন শেষে
চোখে আসে জল,
তোর কথা, তোর স্মৃতি, ক্ষুদ্র বুক ভরে নিতি
বিষাদ কোমল !
সকলি ত মনে আছে সেই হাসি নীল স্নিগ্ধ
চির-কলতান,
সে নিবিড় স্নেহবন্ধ, গাঢ় ছায়া, শ্যামকান্তি
প্রশান্তি মহান্ !
কত প্রীতি কত মায়া আশা স্বপ্ন আলো ছায়া
কত গল্প গীতি,
কত দিন রজনীর দুঃখ সুখকাহিনীর
পুরাতন স্মৃতি !

আজি বহুদিন পরে তেমনি সোহাগ ভরে
আলোকে আশ্বাসে,
কেন, মাগো, স্মৃতি বে'য়ে, এসেছিস্ হৃদি ছে'য়ে
এ দূর প্রবাসে!
গেছে বসন্তের দিন, ছিঁড়েছে সে স্বপ্নজাল,
তবু কেন, হায়,
তোর কথা বারে বারে হৃদয় আকুল করে
বৃথা দুরাশায়!

এসেছিস্ যদি মাগো, আন্ তবে সাথে ক'রে
সে সুখের দিন
আন্, সে যৌবনগীতি, সুধাসিক্ত শতস্মৃতি,
উৎসাহ নবীন!
হিম-স্নিগ্ধ করতল, আশীষ পরশ ছল
সন্ধ্যার সমীর,
ঢেকে দিক্ সব ব্যথা সায়াহ্নের স্নেহমাখা
প্রচ্ছায় তিমির।
তেমনি সৌরভ রাশি, আসুক্ হৃদয়ে ভাসি
নিঃশব্দে আবার,
ভিজাক্ কপোল তল, হিমবিন্দু সুকোমল
স্নেহের আসার।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

কোকিল।

কু-উ, কু-উ, কু-উ! রে কোকিল, তুইত পঞ্চমে কুহরিলি। এই দারুণ গ্রীষ্ম, বিরল মধ্যাহ্ন, অলস জীবন—সঙ্গীহীন—ত্বরাহীন—। তারপর হায়, এই বিদেশ, দূরে পাহাড়, নদী কিনারে বালু, মাঠে কাঁকড়,—তুইত কুহরিলি। কে কোথায় একলাটি জানালায় মুখ রাখিয়া আকাশের মেঘ গণিতেছিল,—সহসা শিহরিল। দীর্ঘ কেশ পাশ, শিথিল বসন, ভাসা ভাসা আঁখি; আর কি তেমন

রহিল ? ব্রীড়াময় রক্তিম কপোল, সংবৃত বেশ, শূন্যকক্ষে চারিদিকে চাহিয়া, হৃদয়ের ক্ষুব্ধ নিশ্বাস। তুইত কুহরিলি !

বন, উপত্যকা ও গিরিশ্রেণীর উপর দিয়া ঐ কুহু ধ্বনি ছুটিয়া চলিল ;—খর রৌদ্র, আকাশে সাদা সাদা পাতলা মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; তারো উর্দ্ধে ঐ কণ্ঠস্বর দিগন্ত ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। আরো—আরো উচ্চে, কোন অনন্তের বুকে এই স্বর লহরী মাথা রাখিয়া নিঝুম ঘুমাইয়া পড়িবে ! চির সুষুপ্তির কোথা সেই দেশ ?

পাখি, তুইত গাহিলি ; আমার প্রাণে এমন বাজিল কেন ? জীবনের সবে এইত প্রভাত ;—প্রভাতের আলো, প্রভাতের বায়ু, প্রভাতের ফুল,—আমার এখনো কত আশা। প্রকৃতি হাসে, মানুষে ভালবাসে, কল্পনা ভুলায়। অন্তরে আমার না জানি মাঝে মাঝে কিসের সঞ্চার ; আমি ভাল বুঝি না, ছুটে যাই ; অন্ধ আবেগে জড়াইয়া ধরি—সেকি প্রেম ? পাখি, তাই তোর কণ্ঠ এমন মধুর ? কি গাহিলি তুই ? কুহু কুহু কুহু ! ওকি কথা ?

ওরে বসন্তের দুলাল, ঝোপের আড়ালে বসে এই যে গলাবাজী ;—এই কচি পাতা, রাঙাফুল, ফুলে মধু—এ কতদিন ? নিদাঘের শ্বাস, বরষার অশ্রু, তারি সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ মর্ম্মবিদারী কুহু ! তুমিত শুধু একলা নও, তারা যে অনেক আছে। যে শুধু তোমাকে চায় সে মূর্খ, সে কাহাকেও পাইবে না। পাপ পুণ্য, হাসি অশ্রু, তার মধ্যদিয়া যে চলিয়াছে,—রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে, জ্যোৎস্নায় হেসে, মাঝে মাঝে তারি পথের আশে পাশের ঝোপ থেকে তুমি ডেকে উঠ। প্রমত্ত পঞ্চম স্বর, একেবারে মর্ম্মে গিয়ে বিঁধে পড়ে। মর্ম্ম কি কোমল, সেই আহত, মৃদু কম্পিত, হৃদি তন্ত্রীচয়, সেথায় সে কি রাগিণী বাজে ? অলস,—করুণ,—উদাস,—মধুর ! ভেসে ভেসে যায়, ঐ তোর শূন্যে লীন স্বর-লহরীর মত।

* * * পাখিরে, আমিত প্রণয়ে নিরাশ নই। আমাকেও ভালবাসে, কিন্তু তবু কেন আশা মিটে না ? কত না চাহিতে পাওয়া, কত যোগ্য নই তারো সম্ভোগ,—তবু, তবু কেন হয় না ? যারা আমায় দিয়াছে— তারা খুব দিয়াছে। তেমনি করিয়া ফিরাইয়া দিবার সাধ্যত আমার নাই,—আমি অক্ষম, আমি অধম। তোর কণ্ঠ আকাশে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে, আর আমার কণ্ঠ ক্রমে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে !

* * * কত যে ভালবাসা পেয়েছি ! কিন্তু যাহারা ভাল বাসিয়াছে তাহারাত শুধু সুখ দেয় নাই, দুঃখও যে দিয়াছে। প্রেম দুঃখ ছাড়া কবে ?

তাইত, তাইতরে পাখি, বাতাস এলে উর্ম্মি যেমন নদীর বুকে লজ্জা ছেড়ে নেচে উঠে, তোর কুহু স্বরেও আমার বুকে তেমনি করে নেচে উঠেছে। বুঝি না, কিন্তু ভুগি ত।

যাহারা ভালবেসেছে, তাহারা আমায় মোহিত করেছে। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া কত অভাবও ত আবার তারাই আনিয়া জুটাইয়াছে। এই অভাব যে চিরদিন থাকিবে। এই অভাব যে মহাদুঃখ, এ দুঃখে যে জীবন কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। পাখীরে, প্রেমে দুঃখ নাই, ঈর্ষা নাই—এমন কোথাও কি তুই জানিস্? মিলনে অতৃপ্তি, বিরহে তন্ময়তা। হয় বাহুর বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে, না হয় আহত চিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

* * * ক্ষুদ্র মানুষ, দুদিনের তুচ্ছ জীবন, পলক ফেলিতে কোথা ভেসে যায়! তার ভাগ্যে কেন প্রেমের এই বিচিত্র বিড়ম্বনা? যখন সকলি ফুরায়ে যায়, তখন কেন না ভেসে যাই, ঐ স্বর লহরীর সঙ্গে! বিরাম আর কোথায় পাইব? মনে হয়, আমার সকলি মুছে যাক্—আমি শূন্যে বিলীন হই!

তুইত দিগন্ত প্লাবিত করিয়া গাহিতেছিস্। বোকা পাখি, মানুষের কষ্ট বুঝিস্ না তাই। তোর মুখ দেখিতে নাই। হায় আমি পুরুষ, নইলে—তবু, জগতে কি একটাও বিরহিনী নাই? তাদের শাপে তুই আজো বেঁচে আছিস্, রে অনাদি কুহু, আমি তাই আশ্চর্য্য হই!

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

সে (গল্প)।

জীবনে তাহাকে তিনবার দেখিয়াছি—তিনটি কোমল ধূসর প্রদোষে। পোষ্ট অফিসের কাছেই ঘন মেহেদির বেড়া দেওয়া একটি পুকুর ছিল, সন্ধ্যার সময় গ্রামবধূরা তাহাতে অবগাহন করিতে আসিতেন। যখন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণে পশ্চিম দিকে দিনের আলো নিবিয়া যাইত, আর অন্ধকার একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়িত, তখন আমিও আপিসের কাজ শেষ করিয়া শ্রান্তদেহে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে এলাইয়া পড়িতাম। একদিন এমনি সময়ে তাহাকে প্রথম দেখি, সন্ধ্যার ছায়ার শুভ্র তারাটির মত! জানিনা কি অদৃষ্ট শক্তির মহিমায় সেই প্রথম দেখাতেই পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া-গিয়াছিল। যেন তীর্থোদ্দেশে একই সময়ে বহির্গত দুইটি সহযাত্রী কতদিন

বিচ্ছেদের পর পথে পুনর্ম্মিলিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পরস্পরকে চিনিয়া লইল। আমার মনে হইয়াছিল সে আমারই জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যরাশি, তাই এত স্বাভাবিকরূপে আমাকে আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু তাহা ভাবিতেছিনা, ভাবিতেছি সেই আর একটি সন্ধ্যার কথা—যেদিন তাহাকে শেষ দেখি। মুমূর্ষুর শীর্ণ জোতিহীন মুখে মৃত্যুকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাটিতে তেমনি একটি মূর্ত্তিমতী নিরাশার ছায়া পড়িয়াছিল। পুকুরের পাড়ে যেখানে একটি শেফালি ফুলের গাছ ছিল, তাহার তলায় মেহেদির অন্তরালে আমি বসিয়াছিলাম; সে আমার পাশেই বসিয়াছিল। পশ্চিমে সুদূর বনরেখার উপর, সূর্য্যাস্তশেষ প্রায়ান্ধকারে দীপ শিখার মত একটা পীতবর্ণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘাট তখন নির্জ্জন, আমাদের গায়ে ও চারিপাশে দু'একটা ফুল পড়িতেছিল, মৃদু সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তার চুলগুলি খোলা, পরণে একখানি শাদা কাপড়,—কোন বেশভূষা ছিল না। আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, সে চাহিয়াছিল মাটির দিকে। গোধূলির ম্লান পাণ্ডুরিমা তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আমি তাহাই দেখিতেছিলাম। ক্রমে তাহা মিলাইয়া গেল, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলি তাহার মুখের উপর অতি সুন্দর আলোছায়ায় পত্ররচনা করিয়াছিল। তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, আমার দিকে একবার চাহিল। তাহার অর্থ আমিই বুঝিয়াছিলাম, আর কেহ বুঝিত না। ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ার দুটি সজল কৃষ্ণতারকা, তাহার উপর অক্ষরের মাত্রার মত দীর্ঘ ভ্রূরেখা। সে কি অক্ষর! বিশ্ব-বিধাতার অতি সূক্ষ্ম ও সুকুমার শিল্প-পরিচয় নারীহৃদয়,—সে বুঝি তাহারই প্রণবসঙ্কেত! প্রেমের অনন্ত বাসর রজনীর একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত আমার চোখে স্বপ্ন জড়িমা আনিয়া দিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে আর তাহাকে দেখিলাম না। সেই নির্জ্জন বাপীতীরে ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে একটি মধুর, স্নিগ্ধ, করুণ চাহনি যে দুইটি মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য অক্ষয় সূত্রে বাঁধিয়াছিল, তাহা কে জানিত?

কিন্তু তাহাকে আর দেখি নাই। সঞ্চারিণী দীপশিখার মত সে আমাকে ক্ষণিক আলোকের পর গভীরতর অন্ধকারে রাখিয়া গেল। সমস্ত দিনের বেলাটি কাজ কর্ম্মের ভিড়ে একরকম কাটিয়া যাইত। কিন্তু যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, আমার মনের ভিতরও একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, কতকি এলোমেলো ভাবিতাম। মনে হইত ওই নিঃশব্দ আকাশের পথই আত্মার উপযুক্ত বিচরণ স্থান। নক্ষত্রপুঞ্জ অনন্তরাত্রির অনির্ব্বাণ দীপমালা। পৃথিবী

যেন মুছিয়া গিয়াছে, কেহ নাই—না, আর একটি আত্মাও নয়। স্মৃতি নাই, আশা নাই, বিষাদ নাই, আনন্দ নাই। শুধু শূন্য—শূন্য, অন্তরে বাহিরে শূন্য। নির্ম্মল মেঘ খণ্ড যেমন বাতাসের স্রোতে ভাসিয়া যায়, আমিও তেমনি ভাসিয়া বেড়াইতেছি। হঠাৎ কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত। বড়ই নীরস, রক্তশূন্য বোধ হইত; তখন মনে হইত, আর একজন, একজন মাত্র—এত নিঃসঙ্গ ভাল লাগে না: প্রাণের ভিতর রোদনাবেগ আসিত; তখন ঠিক আমার মুখের পাশে আর একখানি মুখ জাগিয়া উঠিত; পুলক-স্থির পলকে অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিতাম, দুইটি অচঞ্চল কৃষ্ণতারকা, অতি গভীর স্নেহতরল চাহনি; স্বচ্ছ ললাট-প্রান্তের নিবিড় অলকাবলি আমার কপোল স্পর্শ করিতেছে। সদ্যস্ফুট শেফালির গন্ধ কোথা হইতে আসিল? পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া চাহিয়া দেখিতাম, সাদা মেঘে ও নীল আকাশে আর একটা আলো পড়িয়াছে। আবার নিত্য সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিতাম; আবার কতকি ভাবিতাম, কিন্তু সকলের মধ্যে সেই একটি বালিকা মূর্ত্তি স্বপ্নদ্রষ্টার মত ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন একটা বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইত, গাছগুলি একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিত, আর পুকুরের কাছে একটা শব্দ হইত, আমি চমকিয়া উঠিতাম, যেন কার অপেক্ষা করিতেছি। যদিও স্থির জানিতাম কাহারও আসা অসম্ভব এবং কেহ আসিবে না তবু এই অপেক্ষা করার ভাবটা কখনও আমায় ছাড়িত না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে পড়িয়া থাকিতাম, শেষ রাত্রে একটু ঘুম আসিত, কিন্তু প্রায়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিতাম; ত্রাস্তে উঠিয়া ম্লান জ্যোৎস্নার আলোকে নির্জ্জন পথে অধীর ভাবে পায়চারী করিতাম।

২

শত আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আমি তখন যে গ্রামটিতে বদলি হইয়া আসিয়াছি, সেটি গঙ্গার উপরেই। আমার আপিস বেশ একটি নির্জ্জন স্থানে, গঙ্গা হইতে বেশী দূর নয়। গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টারের ঘটনাবৈচিত্র্যহীন জীবন, নির্জ্জন গিরিনদীর মত নীরব অশ্রান্ত গতিতে কাটিয়া যাইতেছে। অপরাহ্নে গঙ্গার তীরে গিয়া বসিতাম; যে দু'একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল তাহাও এই নদীর তীরে। আমরা যেখানে বসিতাম, সে একটা পুরাণো ভাঙ্গা ঘাট।

সেদিন সকালবেলা হইতে মনটা কেমন ভাল ছিল না, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার একটু আগে একাকী গঙ্গার ঘাটে আসিয়া

বসিলাম। কাহারও সহিত গল্প করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না; তাই যখন দেখিলাম, সরকার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত, তখন ইচ্ছা হইল, উঠিয়া যাই। কিন্তু তিনি ছাড়িবেন না, বিশেষ আমার সঙ্গে এই অল্প দিনেই ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী হইয়াছিল; তাহার কারণ তিনি গল্প করিতে বড় ভালবাসিতেন, আর আমার মত সহিষ্ণু শ্রোতা অল্পই পাইতেন। অভ্যস্ত সম্ভাষণের পর তাঁহার গল্প আরম্ভ হইল। সরকার মহাশয় লোকটী প্রাচীন, অতীত কথাই তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কথা আর কিছুই নয়, গ্রামটিকে আমি যেমন দেখিতেছি, তাহা তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির 'সিকির সিকি'ও নয়। তাঁহারা যখন যুবা ছিলেন, তখন এখানে শতাধিক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, প্রায় প্রতি গৃহে দুর্গোৎসব হইত। মুখুজ্জেদের এমন প্রতাপ ছিল যে বাঘে গরুতে এক জায়গায় জল খাইত; থানার দারোগা গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে, মুখুজ্জে পাড়াটা পদব্রজে অতিক্রম করিতেন। আর, একটা গ্রামে চার পাঁচ খানা বারোইয়ারী পূজা সে ধূমই কত! ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি মাঝে মাঝে একটা 'বটে' বা একটা 'হুঁ' দিতেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছিল। গঙ্গার বুকে দূরে দূরে একটি একটি করিয়া আলো জ্বলিল; মৃদু বাতাসে ঘাটের কোলের কাছে জলটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাঙ্গা পৈঠায় ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে লাগিল, আর ও পারের শিবমন্দির হইতে অস্ফুট ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দু' একটি প্রাচীনা তখনো জলের উপর বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে ছিলেন।

আমার অবসাদ যেন একটু কমিয়া আসিল। একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সরকার মহাশয়, ওই যে দূরে এক জায়গায় গঙ্গার উপর অনেকগুলি আলো জ্বল্‌ছে, ওকি বল্‌তে পারেন?" তিনি একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন 'ও নন্দনপুরের ফ্যাক্টরীর আলো।' বুঝিলাম প্রশ্নটা মনের মত হয় নাই। তাই আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম 'এ ঘাটটা কতদিনের হবে?' এইবার মুখটা একটু প্রসন্ন হইল, বলিলেন, এ অনেক দিনের ঘাট, কিন্তু এর চেয়ে পুরাতন ঘাটের ভগ্নাবশেষ অনেক আছে। আর যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, ঘাট প্রতিষ্ঠাদি কোন সদনুষ্ঠানের ত্রুটি এ গ্রামে ছিল না, এমন কি সেদিনও রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কন্যার নামে ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে এখান হইতে একটু দূরে। আমি বলিলাম 'কন্যার নামে ঘাট প্রতিষ্ঠা!' তিনি বলিলেন 'হাঁ, একটু কথা আছে,' বলিয়া আরম্ভ করিলেন।

৩

রাজনারায়ণ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। প্রথম পক্ষের কেবল একটি মেয়ে। মেয়েটী বড় সুন্দরী ছিল বলিয়া পিতামহ জয়নারায়ণ চৌধুরী বড় ভাল বাসিতেন। অল্প বয়সে মাতৃহীনা বলিয়া আর সকলেও বড় আদর করিত। তাই পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট মেয়েটীকে কোন কুলীন গৃহস্থের ঘরে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও জয়নারায়ণ বাবু বা অপর কেহ সে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য ব্যাকুল হন নাই। তবুও তাহাকে নয় বৎসরের অধিক অনূঢ়া রাখিতে পারিলেন না। শ্রাবণের একটী আর্দ্র উষায় সানাইএর করুণ রাগিণী যখন মঙ্গলানন্দের মধ্যে বিষাদের সুরকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তখন আমারও প্রাণ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটি চিরকালের জন্য পর হইয়া যাইবে ইহা কোন্ পিতার প্রাণে সহে? আমার উমাশশীরও ঐ বৎসর বিবাহ হয়। বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় খুকীকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, দুই বৎসর পরে যখন সে বিধবা হইয়াছে সংবাদ আসিল, তখন তিনি জগতের হাসি-কান্নার বাহিরে।

সকলেই বলিল, মেয়েটীকে এ সময় একবার নিয়ে আসা উচিত। কিন্তু রামনারায়ণ বাবু লোকটী একটু অদ্ভুত রকমের। তিনি বলিলেন নূতন বিধবা-বস্থায় বাপের বাড়ী আসাটা কিছু নয়, বধূর মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অপেক্ষা মেয়ের মত পালন করা শক্ত। আগে এই অবস্থাটা সহিয়া যাউক, তখন আসিবে। লোকে বলিল, 'আহা, মা নেই কিনা, তাই মেয়েটার এমন দুর্দ্দশা।' গ্রামের লোকে মেয়েটীর আর কোন' সংবাদ পায় নাই, শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাইত, অলক্ষণা বলিয়া শাশুড়ী তা'কে বড় যন্ত্রণা দেন। ইহাতেও রামনারায়ণ বাবু কাণ দিতেন না। যখন হঠাৎ একদিন খুকী আসিল, তখন লোকে একটু কাণাঘুসা করিয়াছিল! কেহ বলিল, বড় অসুখ বলিয়া আসি-য়াছে; কেহ বলিল, শাশুড়ী তাহার নামে কলঙ্ক দিয়া চৌধুরীকে লিখিয়াছিল, তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, অবমানিতবোধে রাগের উপর এতদিন পরে মেয়ে লইয়া আসিয়াছেন। কথাটা যাহাই হোক, খুকীর শরীর যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সকলে দেখিল; তাই পূর্ব্বোক্ত কারণটাই লোকে বিশ্বাস করিল।

এদিকে মেয়ে আসিল বটে, কিন্তু দিন দিন সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

রাজনারায়ণ বাবু তাহার চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিলেন,তাহাতে তাঁহার দুর্ণাম অনেকটা ঘুচিল বটে, কিন্তু মেয়ে বাঁচিল না। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত চিত্তে, যেখানে তাহাকে দাহ করা'হইয়াছিল, সেই খানে ঐ ঘাটটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—ওখানে তাহার চিতাভস্ম রক্ষিত আছে।

আমি প্রথমে গল্পটাতে বড় কাণ দিই নাই, কিন্তু ক্রমেই বুকের ভিতর দুর দুর করিতে লাগিল। গল্প যখন শেষ করিলেন, তখন গঙ্গা একেবারে নিস্তব্ধ, খুব অন্ধকার, কোন নৌকা দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে দাঁড় ফেলার শব্দ হইতেছিল। গঙ্গার কাছে একটা কথা আসিয়া আটকাইয়া যাইতে লাগিল, প্রাণপণে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার শ্বশুর বাড়ী ছিল কোথায় ?" উত্তর শুনিলাম "মহানন্দপুর, কোন জেলা জানি না।" আমি পাগলের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—কত বার কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না।

যখন আপিস ঘরে পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দশটা। জানালাগুলা সব বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। আমার আট বৎসরের রুদ্ধ হৃদয়াবেগ আজ আর বাধা মানিল না।

অদৃষ্টের রহস্য চিন্তা করিয়া আজও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। মনে করি সে আমার কে ছিল? তাহার সহিত সম্পর্ক কি? কিন্তু অদৃষ্ট আমার জীবন নাট্যের যে দুইটি অঙ্কে পটক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গতি এবং সমাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজি বুঝিতে পারি, অভিনয়ের অনেকটা আয়োজন নেপথ্যে, অনেক সত্যের মূল সেই খানে। জন্ম জন্মান্তরে কে অবিশ্বাস করিবে? আমি ত করি না। আমার শুকতারা জন্মান্তরের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া উদিত হইয়াছিল, ইহজন্মের স্মৃতির মধ্যে অস্ত গিয়াছে, কে বলিবে, জন্ম মরণের আর কোনও আবর্ত্তনে আমার পাশেই উদয় হইবে না! ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাই সে দিন অকস্মাৎ গঙ্গার তীরে আঁধার সন্ধ্যায় সেই অশ্রু কাহিনীর স্মৃতিকঠিন অঞ্চলবন্ধনে সে আমার ইহকালের জীবিতচেতনা বাঁধিয়া রাখিল—যদি কোনও বসন্তপ্রদোষে এ পুণ্ডরীক মহাশ্বেতা শাপাবসানে আবার চির পরিণীত হয়।

কতক্ষণ এই রূপভাবে পড়িয়াছিলাম জানি না। বোধ হয় জ্বরে যেমন তন্দ্রা আসে, তেমনি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। তাহাও যখন কাটিয়া গেল, উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলাম। তখন একটা মৃদু আলোকে চারিদিক জাগিয়া উঠিয়াছে, নবমীর ক্ষীণ চন্দ্র খণ্ড এক দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ঘরের

ভিতর আর থাকিতে পারিলাম না। কে যেন আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। ম্লান আলো ও ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া চলিয়া গেলাম, পৌছিলাম, সেই নূতন ঘাটটিতে। বুকটা একবার ধড়াস করিয়া উঠিল, কিন্তু সে একবার।

খোলা মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। কিছু পরে আমার চিত্ত একেবারে স্থির হইয়া গেল। আকাশে, বাতাসে, জ্যোৎস্নায় কি অহিফেনের মত একটা মাদকতা ছিল? তাই বেদনার অনুভূতি হ্রাস হইয়া গেল? না,অতি নিকট হইতে গোপনে অলক্ষ্যে কে আমার প্রাণে তাহার শান্তি সঞ্চার করিল। গঙ্গা তখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্তম্ভিত নিস্তরঙ্গ বুকে জ্যোৎস্না মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। উপরে নিশীথিনীর অনন্ত নক্ষত্র বাসর। নক্ষত্রে যেন ও কার মুখ! নিম্নে চক্ষু ফিরাইলাম। হঠাৎ কোণের দিকে উঁচু স্তম্ভের মত একটা কি দেখিতে পাইলাম। আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া সেটা ধরিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই; স্তম্ভগাত্রে কয়েকটি অক্ষরের মত কালো রেখা সমষ্টি। মাথা হেঁট করিয়া নামটি পড়িতে গেলাম, চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে মধুর ভজন।

আজ যে কুসুমটী ফুটিল, লোকের চক্ষুর সম্মুখে শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল, সৌরভে মনঃপ্রাণ অপহরণ করিল, কাল সে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইল, তাহার সকল গৌরব ফুরাইল। শিশুটী জনকজননীর নেত্রকৌমুদীরূপ হইয়া জন্মিল, শৈশবচাপল্যে তাঁহাদিগকে মোহিত করিল, পরে ক্ষণকাল সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া যবনিকার অন্তরালে লুকাইল! তুমি সংসারে অশেষ বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অতুল অধ্যবসায় ও পুরুষকার প্রভাবে বিপুল ধন ও মান উপার্জ্জন করিলে, কিন্তু তোমার পরিশ্রমের ফল তোমাকে নিষ্ঠুর কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, দুরতিক্রম কাল তোমাকে বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত করিল।

সংসার এইরূপ অনিত্যতার বিলাসক্ষেত্র। এই অনিত্যবস্তুতে আসক্তি জীবের সকল দুঃখের মূল। অনিত্যবস্তু হইতে নিত্যসুখ কামনা মরুভূমিতে বারিপ্রার্থনার ন্যায় নিষ্ফল। যাঁহারা সংসারের অনিত্যত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া-

ছিলেন এবং অনিত্য সুখস্পৃহা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যস্মৃতি ঋষিগণ প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়"

অর্থাৎ আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

কিরূপে সেই সদ্ বস্তুকে পাইব, যাঁহাকে পাইলে আর মৃত্যুপূর্ণ দুঃখময় সংসারে বারবার গতাগতি করিতে হয় না,—এই চিন্তাই বিবিধ দর্শন শাস্ত্র ও ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ। সকল শাস্ত্রই মুক্তিকে (অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে) একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সেই মুক্তিলাভের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায় বলেন—প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি। বৈশেষিক বলেন—দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের মুক্তি হয়। মীমাংসক বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে মুক্তির উপায় স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সাংখ্য বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা ভেদজ্ঞান মুক্তির একমাত্র উপায়। পাতঞ্জল সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার উপর ঈশ্বর তত্ত্ব যোগ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মের স্বরূপাবগতিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে মোক্ষের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত পন্থাকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ। বহুকাল হইতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্মের বন্ধন-শক্তি তিরোহিত হয়। এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তি ভগবত্তত্ত্বোদ্ঘাটনে প্রযুক্ত হইলে উহাদের মধ্যে তাদৃশ বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানী, ভক্ত প্রভৃতি সকলেই একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসনা করিয়া থাকেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীভগবানের নিকট জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন

যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আরাধনা বিষয়ে কোন্ পথটী প্রশস্ততর ?' তদুত্তরে ভগবান্ ভক্তিমার্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুকরত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন যথা,

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্য যুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য নিবিষ্ট চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

এই ভক্তি যোগের উপর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞানের যেরূপ আদর, ভক্তির তাহা অপেক্ষা বেশী আদর নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ। এখানে জ্ঞান বা কর্ম্ম ভক্তির প্রতিযোগী হইতে সাহস করে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাধ্য সাধন প্রসঙ্গে ভাগবতশ্রেষ্ঠ রামানন্দ রায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী উত্তমা ভক্তির লক্ষণ-কথনে ভক্তিকে 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত' করিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

বৈষ্ণবের রাজ্য প্রেমের রাজ্য। রাগানুগা ভক্তি দ্বারা সেই প্রেমরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ; লালসাময়ী ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তিনি উপভোগ্য। যে ব্রহ্মজ্ঞান জীবব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া সেই রাগানুগা ভক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা বৈষ্ণবের প্রেমরাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। সেই জন্য বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মজ্ঞানলভ্য, জ্ঞানিগণকাম্য সাযুজ্যাদি মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ভগবান্ ভক্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

বৈষ্ণব শ্রীভগবানের সহিত একত্ব প্রার্থনা করেন না এবং তৎপ্রদত্ত ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধিরও আদর করেন না।

বৈষ্ণব ভগবানকে জানিয়াই সন্তুষ্ট হন না, তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে চাহেন এবং তাঁহার সহিত প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই আত্মীয়তানন্দে বিভোর হন। বৈষ্ণবের নিকট ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, বা পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা নহেন, তিনি বৈষ্ণবের অতি প্রিয় জন। বৈষ্ণব ভগবানের মুখে কালের ত্রাসোৎপাদী ভ্রূকুটী দেখিতে পান না। তিনি [illegible]

ভক্তাহ্লাদন সুমধুর হাস্য ; বৈষ্ণব ভগবানের হাতে কঠোর শাসনদণ্ড দেখিতে পান না, বৈষ্ণব দেখেন, তাঁহার হাতে জগদ্বিমোহিনী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বংশী।

বৈষ্ণব এইরূপে শ্রীভগবান্‌কে অতি প্রিয় ভাবিয়া লইয়া তাঁহাকে ভালবাসেন, এবং তাঁহার সহিত পতি, পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বৈষ্ণব কখনও প্রভুজ্ঞানে ভগবানের স্তব করেন, কখনও পুত্রজ্ঞানে ভগবান্‌কে স্নেহ করেন, আবার কখনও বা কান্তাভাবে তাঁহার উপর অভিমান করেন, তাঁহাকে তিরস্কার করেন। রসিক-শেখর শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী ; তিনি বৈষ্ণবের আন্তরিক পবিত্র প্রেমটুক লক্ষ্য করিয়া এরূপ অভিমান ও ভৎর্সনা সহ্য করেন, এমন কি তাহার আদর করিয়া থাকেন। তিনি বলেন,—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই মোর হরে মন॥

ভগবান্ যত লীলা করেন, তার মধ্যে তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া প্রাকৃতিক সম্বন্ধ মস্তকে বহন করিয়া যে মানুষ লীলা করেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যময় ও বৈচিত্রময়। এই বিচিত্রতা তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই বিচিত্রতাই তাঁহার নরলীলার সর্ব্বোত্তমত্বের কারণ। তাঁহার নরলীলা যদি শুধু মাধুর্য্যময় হইত তবে তাঁহার লীলার ও প্রাকৃত মানুষের কার্য্যে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। ভগবানের নরলীলা মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের ঘন আবরণে শমীবৃক্ষান্তঃস্থিত বহ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে থাকে। ঐশ্বর্য্য একেবারে লুপ্ত হয় না ; গোবর্দ্ধনধারণাদি অলৌকিক কার্য্যে মধ্যে মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইয়াথাকে, কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের শত্রুতা করেনা। বিদ্যুল্লতার ক্ষণিক বিলাস যেমন অন্ধকার দূর না করিয়া উহা ঘনীভূত করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের ক্ষণিক বিকাশ মাধুর্য্য-বিঘাতক না হইয়া বরং তাহার পুষ্টিসাধক হইয়া থাকে। যেমন পুত্রকে সংসারে উচ্চপদস্থ দেখিয়া মাতার হৃদয়ে সাধ্বসের উদয় হয় না, বরং 'আমি ঈদৃশ গুণী পুত্রের মাতা' এই জ্ঞানে তাঁহার হৃদয় গৌরবে ও স্নেহে পূর্ণ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলীলার সহায়স্বরূপ ব্রজপরিকরগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আলৌকিক লীলা দর্শনে সম্ভ্রমের উদয় হইত না, বরং "ঈদৃশ অমানুষা শক্তিমান্ কৃষ্ণ আমাদের প্রিয়" এই জ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় স্নেহরসে সবিশেষ আপ্লুত হইত।

বৈষ্ণবেরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের মাধুর্য্যভাবের উপাসক। তাঁহারা মাধুর্য্যভাবের পোষক দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাবে ভগবানের আরাধনা

করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আপনাকে দাস ভাবিয়া ভগবান্‌কে প্রভুজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সঙ্কোচ ও ভয়ের প্রাচুর্য্য থাকায় দাস্য-ভাব মাধুর্য্যময় প্রেমের ততদূর পুষ্টিকর হয় না। এই সঙ্কোচের অভাব হেতু সখ্যভাব শ্রীভগবান্‌কে আরও আপনার করিয়া লয়। সখ্যভাবে—উনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ আরে আমি সামান্য জীব এরূপ প্রেমসঙ্কোচকরী বুদ্ধি থাকে না। এরূপ গুরুলঘু ভাব বলবান্ থাকিলে জীব কখনও ভগবান্‌কে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হয় না। সখ্যভাব অপেক্ষা বাৎসল্যে স্নেহের ভাগ অধিক। বাৎসল্যভাবে সাধক আপনাকে পালক জ্ঞান করিয়া ভগবান্‌কে পাল্য বোধে স্নেহ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বাৎসল্যভাবেও আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভাব ও বৃত্তিগুলি চরিতার্থতা লাভ করে না বলিয়াই মধুরভাবের বা কান্তাভাবের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা। মধুরভাবে দাস্য সখ্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের সমাবেশ আছে বলিয়া বৈষ্ণবগণ মধুরভাবের বা কান্তাভাবের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অনুরক্তা কান্তার চিন্তাস্রোত যেরূপ সর্ব্বতোভাবে কান্তকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, মাতার পুত্র-বিষয়িনী চিন্তা, বা দাসের প্রভুসম্বন্ধিনী চিন্তা সেই সেই বিষয়ে ততদূর অব্যভি-চারিনী নহে। কান্তা ভাব সর্ব্বদা অনুরাগপূর্ণহৃদয়ে ভগবচ্চিন্তনের বিশেষ অনুকূল বলিয়া বৈষ্ণবগণ ইহার এত আদর করিয়া থাকেন।

কান্তা দ্বিবিধা, স্বকীয়া এবং পরকীয়া। স্বকীয়া কান্তা পতির সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধা। পরকীয়া স্ত্রী পাতিব্রত্যধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষকে অভি-লাষ করে। যে বস্তু অতি সহজে বা বিনা যত্নে পাওয়া যায় সে বস্তুতে লোকের সবিশেষ আগ্রহ বা আস্থা দেখা যায় না। দুর্লভ বস্তুতেই লোকের স্পৃহা সম-ধিক বলবতী। বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট পতি অনেকটা সুলভ। পরকীয়া স্ত্রীর নিকট প্রণয়ী অতিশয় দুর্লভ; সেই জন্য পরপুরুষাসক্তা স্ত্রী মনে মনে অহরহঃ জারসঙ্গ চিন্তা করিয়া থাকে—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

যাহাতে শ্রীভগবচ্চিন্তা ব্যাকুলতাপূর্ণা ও অনুরাগময়ী হয়, তজ্জন্য অনেক বৈষ্ণব মধুরভাব আশ্রয় করিয়া, আপনাদিগকে পরকীয়া কান্তা কল্পনা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে জারবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন।

এরূপ জুগুপ্সিত ভাবে আরাধনা করিলে জীবের কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে

এবিষয়ে অনেকে সংশয়াকুল হন। এ বিষয়ে রাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—দ্রব্যশক্তি ক্রিয়াবিষয়ে দ্রব্যজ্ঞানের অপেক্ষা করে না। অমৃতকে বিষবোধে পান করিলে যেমন অমৃতের ক্রিয়াই হইয়া থাকে, বিষের ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবান্‌কে উপপতি ভাবে ভজনা করিলে জীবের কল্যাণই হইয়া থাকে। নিরন্তর শ্রীভগবদনুশীলনমাত্রই, তাহা অনুকূল ভাবেই হউক বা প্রতিকূল ভাবেই হউক, জীবের কল্যাণকর হইয়া থাকে। কংস ও পূতনা শ্রীকৃষ্ণের বৈরাচরণ করিয়াও যোগিবাঞ্ছিত মোক্ষপদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

শ্রীমণিভূষণ সেন।

পতিত জাতি।

হিন্দু সমাজে যে সকল অন্ত্যজ ও নমঃশূদ্র জাতি অজলস্পর্শনীয়তা প্রভৃতি কারণে পতিত বলিয়া গণ্য তাহাদিগের উদ্ধারের প্রশ্ন আধুনিক আন্দোলনের অন্যতম বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালে কঠোর সামাজিক সমস্যা লইয়া যে সকল সভা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন সমিতিতে এই পতিত জাতিদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইলে সমাজের একটী মহদনিষ্টের নিবারণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সম্ভবতঃ সমাজের সুধীবৃন্দও একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের যাঁহারা শীর্ষদেশে অবস্থিত, যাঁহারা তর্জ্জনী-সঙ্কেত দ্বারা সমাজ পরিচালনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে পৃথিবীর যে কোন সভ্য জাতির মনস্বিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিম্নে যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দেশের সর্ব্বস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাহারা অহোরাত্র পরিশ্রম দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য মুষ্টিমেয় মাত্র অন্নের সংস্থান করিয়া তাহাদিগের পরিশ্রমজাত ফলের অধিকাংশ দেশের ধনিগণের বিলাসিতার জন্য দান করিতেছে, তাহারা কি মহান্ধকারে নিপতিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে সংশিক্ষার অভাবে সমাজে কি অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেনা। পঞ্চ কোটি ভারতবাসী অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইয়া, দারিদ্রের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দিবারাত্র বিঘূর্ণিত হইয়া, সমাজে ঘৃণিত অস্পৃশ্য ভাবে জীবন যাপন করিতেছে উচ্চ জাতীয়দিগের অনাদর ও অযত্নে তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি পরিস্ফু

হইবার সুযোগ হইতেছে না, তাহাদিগের নৈতিক উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু সমাজ কথনই অনুদার নহে। হিন্দু ধর্ম্ম চিরকালই উদার। পাপীর পরিত্রাণ করিবার জন্য হিন্দু সর্ব্বদাই প্রস্তত। পাপ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান হিন্দু ধর্ম্মে আছে। এরূপ একটী উদার সমাজের মধ্যে যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায় ইহা কলঙ্কের কথা। সর্ব্ব প্রথমে আচার বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ সমূহ দ্বারা উচ্চ নীচ জাতি বিভাগ হইয়াছিল যথার্থ এবং পরে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে মানব সমাজের উচ্চ অথবা নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শাস্ত্রানুসারে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মফল দ্বারাই হউক আর যে কারণেই হউক কোন ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে সে একেবারের অস্পৃশ্য, অনাদরণীয়, সমাজের মধ্যে হেয় বলিয়া গণ্য হইবে তাহার কোন কারণ নাই। কালকেতু শাপ-প্রভাবে ব্যাধ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কি তাঁহার নাম আজিও হিন্দু মাত্রেরই মুখে ঘোষিত হয় না? সেই কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা কি ব্যাধকুলে জন্মিয়াই সতীশিরোমণি বলিয়া আজিও পূজিতা হন না? নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে তাহার অন্তঃকরণে মহদ্‌গুণ সমূহ থাকে না, অথবা উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের স্বভাবজাত প্রবৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষতা সাধন করা যাইতে পারে না তাহা নহে। পরন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই প্রকৃতিগত মহত্ব, শিক্ষার অভাবে এবং সংসর্গের দোষে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায় ও তাহাদিগের নৈতিক অধঃপতন হইয়া থাকে।

ইতর কুলে জন্ম, ইতরের ন্যায় আচরণ ও ইতর সমাজে অবস্থান দ্বারা মানুষকে ইতর করে। জন্মের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। শিক্ষার দ্বারা এবং উত্তম আদর্শ দেখিয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে এবং ভদ্র-সমাজ ইচ্ছা করিলেই ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষকে ইতর-সমাজের সহিত মিশিতে না দিয়া আপনাদিগের সংসর্গে রাখিতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া সৎসংসর্গে বাস করিলে ইতর প্রকৃতির ব্যক্তিও সৎ হইয়া যাইতে পারে। ইতর শ্রেণীর মধ্যে যাহাদিগের স্বভাব প্রকৃতি ভাল, তাহারা ত অতি শীঘ্রই উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাই সম্ভব হয়, যদি সুযোগ পাইলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া সমাজের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা হইতে বঞ্চিত করা পাপ।

একলব্য জাতিতে চণ্ডাল, সুতরাং অস্পৃশ্য, ও বেদে অধিকারবিহীন। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য—ক্ষত্রিয় রাজকুমারদিগের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য,—কিরূপে এই অস্পৃশ্যজাতীয় শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করিবেন? তাহা হইতে পারে না। উদার হিন্দুধর্ম্ম যাহাই বলুক না কেন, ব্রাহ্মণ গুরু কথনই চণ্ডাল শিষ্যকে বিদ্যাদান করিয়া আপনার ধর্ম্ম নষ্ট (?) করিতে পারেন না। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে অনাদর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। একলব্যের অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল, চণ্ডালকুলে জন্ম হইলেও তাঁহার স্বভাব সৎ ছিল, তাঁহার ভদ্রোচিত প্রকৃতি ছিল। কত আকাঙ্ক্ষা করিয়া, কত উচ্চ আশা পোষণ করিয়া যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন, সেই গুরু তাঁহাকে কুক্কুরবৎ ঘৃণা করিয়া বিতাড়িত করিলেন, তথাপি তিনি হতাশ হইলেন না, অরণ্য মধ্যে স্থাপিত দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া অদ্ভুত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের জড়মূর্ত্তিকেই তিনি দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিলেন এবং সেই মূর্ত্তিই জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমির দূর করিয়া তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল।

অনাদর অবজ্ঞা স্বত্বেও একলব্য কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। স্বকীয় মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন লোক একলব্যের সমান হইতে পারে? কয়জন লোক এইরূপে অনাদৃত হইয়াও আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয়? কয়জন লোক ঘোর অসুবিধা স্বত্বে, ঘোর লাঞ্ছনা ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হয়? সমাজের নিম্নজাতীয়েরা প্রতিনিয়ত যেরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হয় এবং তাহাদিগকে যে ঘোরতর অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে বাস করিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সুযোগ কোথায়? সুযোগ অভাবে যে কত শত একলব্যের স্বভাবজাত গুণরাজি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইহার কি প্রতিকার নাই? কেন থাকিবে না? মহাপ্রভু চৈতন্য যে প্রকারে জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়াছিলেন, যে উপায়ে যবন হরিভক্ত হইয়া হরিদাস ঠাকুর নামে খ্যাত হইয়াছিল, সেই উপায়ে তাহাদিগেরও উদ্ধার হইতে পারে। সেই উপায় বিশ্বপ্রেম। জগতের সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগের মধ্যে প্রেম বিলাইতে পারিলেই তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে, তাহারা জগাই মাধাইর ন্যায় পদপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িবে; তথন তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে যে সৎশিক্ষার বীজ বপন করা হউক না কেন তাহাই অঙ্কুরিত

হইবে। প্রেমই ধর্ম্ম, মিলনই ধর্ম্মের মূলভিত্তি, বর্জ্জনে ধর্ম্ম নাই। তাই বলি জগৎকে প্রেম বিতরণ কর, পরকে আপন কর ঘৃণ্যকে আদর কর। যখন তাহারা দেখিবে যে তুমি তাহাদিগকে পবিত্র প্রেমালিঙ্গন দ্বারা আপনার করিতেছ, যখন তাহারা দেখিবে যে তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ, তখন তাহারা তোমার ভক্ত হইবে, তোমার অনুশাসন আনন্দচিত্তে প্রতিপালন করিবে।

আপনার করিতে হইলেই যে জাতিগত পার্থক্য একেবারে ভুলিতে হইবে, একথা বলিতেছি না। তুমি ব্রাহ্মণ, সমাজে তোমার স্থান সর্ব্বশীর্ষদেশে অবস্থিত, তোমার স্থান অটল থাকিবে, বরং পতিতের উদ্ধার করিতে পারিলে তুমি আরও পূজ্য হইবে ; তুমি ক্ষত্রিয়, তোমারও স্থান যেমন আছে তেমনই থাকিবে ; তুমি বৈশ্য, তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না। সমাজে যে যে রূপ অবস্থায় আছে তাহাতেই থাকিবে, কেবলমাত্র অনাদর অবজ্ঞার মাত্রাটা কিছু হ্রাস করিলেই সকল গোলের মীমাংসা হইয়া যায়। একটা জাত চিরকাল অন্ত্যজ বলিয়া অজল-স্পর্শনীয় ভাবে বাস করিতেছে এবং তাহাদিগকে তোমরা ঘৃণা করিতেছ ; কিন্তু তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে এক স্তর উঠাইয়া দিতে পার, তাহাদিগের অজল-স্পর্শনীয়তা দূর করিতে পার। যদি তাহাদের আচার ব্যবহার ভাল হইয়া থাকে, যদি তাহারা পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতাগুণে অস্পৃশ্য না হয়, তবে তাহাদিগের সহিত ব্যবহারিক ভাবে যতটা দূরত্ব আছে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করায় ক্ষতি কি? বরং যখন তাহারা দেখিবে যে তোমরা দয়া করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়াছ, তখন তাহারা আপনাদিগকে তোমাদিগের যথেচ্ছ শাসনের অধীন বলিয়া মনে করিবে না, অধিকন্তু তোমাদিগের সহৃদয়তার জন্ম চিরকাল বশীভূত হইয়া থাকিবে। আরও যাঁহারা সমাজের মস্তক, কি উপায়ে সমাজের হস্তপদ বলিষ্ঠ হয় তাহা দেখা তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। নচেৎ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হস্তপদের উপর পরিপুষ্ট ও বৃহৎ মস্তক স্থাপন করিলে রীতিমত রক্ত সঞ্চালন হইবে না।

এখন যাহারা অন্ত্যজ জাতির মধ্যে গণ্য তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার অনেকটা বিস্তার হইয়াছে এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে একটা যোগ্যতর স্থান দিলে যে সকল নীচজাতি কদাচরণ করে তাহারাও ক্রমশঃ ভাল হইবার চেষ্টা করিবে। শুধু তাহাই নহে, যাহারা নিজেদের অর্থ, বিদ্যা ও সভ্যতার বলে উন্নতিলাভ করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া না লইলে

অনেক সমাজ তাহাদিগের উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। অথবা তাহারা জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিবে। তখন সমাজের নেতৃগণের মানসম্ভ্রম কোথায় থাকিবে? এখন যাহারা তাঁহাদিগকে বড় বলিয়া মানিতেছে, তখন তাহারাই মানিবে না; ইহাই ফল হইবে। দেশকাল-পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করাই বিবেচকের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সকলেই দিন দিন আপনাদিগের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। সে উন্নতির গতিরোধ করিতে গেলে বালির বাঁধ দিয়া নদীস্রোত প্রতিরোধের চেষ্টা করা হইবে; যাঁহারা বাঁধ দিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকেই অকৃতকার্য্য হইতে হইবে। নদীর গতি সুবিধামত ভাবে সংযত করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। অতএব পতিত জাতির উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে একেবারে সমাজের নিম্ন স্তরে ফেলিয়া না রাখিয়া যদি তাহাদিগকে একটা নিয়মের অধীন রাখিয়া উদ্ধার করা হয় তবে কোন গোলযোগ হয় না; বরং নিজেদের উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়।

সমাজের হস্তপদ দৃঢ় করিবার জন্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যক। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিলে তাহারা আর ভদ্রসমাজকে বা উচ্চ জাতিকে একেবারে মানিবে না এবং ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে, এইরূপ অনেকের ধারণা। কিন্তু উপযুক্ত অশ্বারোহী যেমন রশ্মি-সংযত করিয়া অশ্বকে বাধ্য রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহাদিগের উদ্দাম প্রবৃত্তি-নিচয় দমিত থাকিবে। তাহাদিগের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহারা বরং ভদ্রসমাজের অধিক বাধ্য হইবে এবং সদুপায়ে পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবে। ইতর জাতীয়দিগের মধ্যে পাপাচরণের পরিমাণ এখন অত্যধিক; তাহাদিগের মধ্যে সুশিক্ষা দান করিয়া সেই সমস্ত দোষগুলি পরিত্যাগ করাইতে পারিলে ক্রমশঃ তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গেলে সদুপদেশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে এবং ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে শিখিবে।

ইতর শ্রমজীবিগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিবার একটী উপায় নৈশবিদ্যালয় স্থাপন। সহরের মধ্যে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ পালা করিয়া এই সকল নৈশবিদ্যালয় পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এবং মফঃস্বলে সুশিক্ষিত ভদ্রগণ সমস্ত দিন নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ করিয়া নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিবার ভার লইতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যের

বিশেষ ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা খেলাধূলা বা অন্যান্য প্রকার আমোদ প্রমোদে যে সময় ব্যয় করিতেন, কেবল সেই টুকু সময় যদি আমোদের পরিবর্ত্তে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন তবে তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মই হইবে। নৈশবিদ্যালয়সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিবার নিয়ম আছে। সুতরাং ইহা স্থাপন করিতে পারিলে সরকারী সাহায্যও কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে এই সাহায্যের অসদ্ব্যবহার হয়। অনেক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণ নৈশবিদ্যালয়ের নাম করিয়া সরকারী সাহায্য লইতে থাকেন; পরিদর্শক কর্ম্মচারী আসিলে পাঠশালার জনকয়েক পুরাতন ছাত্রকে ডাকিয়া বসাইয়া দেন এবং এইরূপে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চনা করেন। যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই সাহায্য দান করেন তাহা অতি মহৎ; কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া তাহার সদ্ব্যয় হয় না। ইতর শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার নাম করিয়া সাহায্য লইয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করা কত পাপ, তাহা এই সকল পণ্ডিত নামধারী প্রবঞ্চকের ধারণায় আসে না। গ্রামের ভদ্রলোকগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য; যাহাতে এই সাহায্যের টাকা প্রকৃত কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা এবং গ্রামের ইতর শ্রমজীবিগণকে সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষকের নিকট সমবেত হইয়া লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহিত করা। এই কার্য্য অতি সহজ এবং কেবল তাঁহাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ।

কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিলে নানা উপায়ে তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায়। মানব মাত্রেই সমাজের এক একটী অঙ্গ এবং এক অঙ্গ রুগ্ন হইলে, সমস্ত দেহই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যে অঙ্গ সবল, তাহাকে দুর্ব্বল অঙ্গের পুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, নচেৎ উপায়ান্তর নাই। সমাজের ও দেশের কার্য্যের জন্য অবশ্য নিজের স্বার্থের কিছু হানি হইতে পারে; কিন্তু আপনার স্বার্থের সহিত সমাজের স্বার্থ এরূপ ভাবে বিজড়িত যে সমাজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নিজের কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না। এ বিষয়ে বারান্তরে আরও অনেক কথা বলিবার থাকিল। আশা করি এ দিকে সমাজ-সংস্কারক ও নেতাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রমীলা ও ইন্দুবালা

প্রমীলা ও ইন্দুবালা বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যপাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত। উভয়েই কবির বিচিত্র, নিরুপম ও অভিনব সৃষ্টি। দুই একটী স্থল ব্যতীত উভয়ের জীবনের ঘটনাবলী স্থূলতঃ একপ্রকার। দুইজনেই দৈত্যকন্যা; দুইজনেরই শ্বশুর শিববরে বলীয়ান্, মহাপরাক্রমশালী, সুরবিদ্বেষী দৈত্যরাজ। উভয়েই সাধ্বী, বীরপত্নী ও স্বামী-সোহাগিনী। উভয়েরই পতি যুবরাজ, মহাবীর, পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ও পিতৃ-শত্রু বিনাশ-প্রয়াসে নিহত। কিন্তু সেই দুইটী অনুপম চরিত্র-চিত্রণে দুইজন অমর কবি বিভিন্ন পথে কিপ্রকারে অসামান্য সৃষ্টিকৌশল, অদ্ভুত রসজ্ঞতা ও চরিত্রাঙ্কনদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব সেই দুইটী চরিত্র পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব; ফলাফল সুধীগণের বিচার প্রতীক্ষা করিবে।

প্রমীলা মধুময় মধুসূদনের অমরকাব্য মেঘনাদ-বধের নায়িকা,—মেঘনাদের পত্নী; ইন্দুবালা হেমোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের বৃত্র পুত্রবধূ,—রুদ্রপীড়ের সহধর্ম্মিনী। আমরা মেঘনাদ-বধে প্রমীলার প্রথম সাক্ষাৎকারলাভে দেখিতে পাই তিনি প্রমোদ উদ্যানে প্রভাষাবেশিনী রমার মুখে বীরবাহুর নিধন ও রাবণের যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ বার্ত্তা শ্রবণে যুগপৎ বিস্মিত, রোষান্বিত ও লজ্জিত, সমরক্ষেত্রে গমনোদ্যত, রথারোহনোন্মুখ মেঘনাদের করযুগল ধারণ করিয়া কহিতেছেন;—

—কোথা; প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কমনে ধরিবে প্রাণ তোমার তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায় নাথ, গহন কাননে
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করিপদ; যদি
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?”

মেঘনাদ মৃতশত্রুর পুনর্জ্জীবন লাভ, প্রিয় ভ্রাতার নিধন ও নিজে প্রমোদ উদ্যানে বিহারপরায়নঅবস্থায় পিতার যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়, রোষ ও লজ্জায় আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রমীলাকে না বলিয়াই সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে প্রমীলা উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন। কবি এস্থলে প্রমীলার নারী-স্বভাব-সুলভ পতিপ্রেম ও পতিবিচ্ছেদবিধুরতা প্রকটিত করিয়া-

ছেন এবং তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ প্রিয়তমা পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিলেননা। তিনি স্মিতমুখে

—"ইন্দ্রজিতে জিতে তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি! সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে, বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি!"

এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রায় প্রমীলার বাধাদিবার দুইটী কারণ প্রতীত হয়—প্রথম, পতি-বিচ্ছেদ-দুঃখ; দ্বিতীয়, পতি বিনাশাশঙ্কা। দুইটীই স্বার্থ-প্রণোদিত—তাহাতে উচ্চ নির্ম্মল নিঃস্বার্থ ভাবের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে গমন করিলে তাঁহার ক্ষণিক পতিবিচ্ছেদজনিত দুঃখ উপস্থিত হইবে অথবা সমরে পতির নিধন ঘটিলে তাঁহাকে অকালে বৈধব্য দশায় নিপতিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এই চিন্তায় প্রমীলার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই ভাব তাঁহার উল্লিখিত কাতরোক্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বীরপত্নী ও স্বয়ং বীর্য্যবতী হইয়াও স্বার্থ প্রেরিত দুর্ব্বলতা দমন করিতে পারেন নাই।

বৃত্রসংহারে ইন্দুবালার প্রথম আবির্ভাব, রুদ্রপীড় পিতার আজ্ঞানুসারে নৈমিষারণ্যে শচীকে আনিতে যাইবার পর। প্রমীলার ন্যায় ইন্দুবালা পতির গমনকালে উপস্থিত হইয়া যাত্রায় বাধা দেন নাই; কারণ, তিনি পতির রণ-যাত্রার বিষয় অবগত ছিলেননা। রুদ্রপীড় পিতার সভায় উপস্থিত থাকায় সময়ে দূতমুখে জয়ন্তকর্ত্তৃক ভীষণ দৈত্যের নিধন সংবাদ শ্রবণে ক্রোধোদ্দীপ্ত বৃত্র

'"রুদ্রপীড় পুত্র; শুন কহিরে তোমারে'
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় দৃষ্টি দিয়া;
'যশোলিপ্সা তব চিত্তে—অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, ইন্দ্রসুতে আরতি করিয়া।
'শচীরে আনিতে যাহ এ মম আলয়ে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে,
শতবোধ সঙ্গে লহ—যাহে ইচ্ছা তব:
অচিরাৎ এ আদেশ পালহ আমার।'"

পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রুদ্রপীড় তৎক্ষণাৎ শচীকে আনিবার জন্য নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন, পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার তাঁহার অবকাশ ছিলনা। ইন্দুবালা পরে স্বামীর মর্ত্ত্য-দেশে গমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কিপ্রকারে কালযাপন করিতেছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব রতির নিকট যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কবিবরের সুমধুর ভাষায় শ্রবণ করুন;—

"বৈজয়ন্ত ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ অন্তরে তার,
ইন্দুবালা নাম রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায় ;
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণ কান্তি সুশোভন
যেন কিশলয় চারু মনোহর
তেমতি দেহ গঠন!
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছসি উছসি চলে ;
(কাছে বসি রতি) করেতে ধারণ
গ্রন্থন রজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরদেশ পরে।
চারিদিকে আলাকুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবাতে, উরসপরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে!
অর্দ্ধভঙ্গ স্বর, ঘর্ম্মবিন্দু ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কতদিনে আসা যায়।
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সেজন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কিরণে তেঁহ ?"

শচী শক্রপত্নী ; তত্রাপি পতি তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবায় নিযুক্ত করিবেন এই দুশ্চিন্তায় তাঁহার পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে! নৈমিষারণ্যে শরীররক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ আছেন কি না জানিবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! বরং স্বামী রণে পরাজিত হউন, তিনি তাহা সহ্য করিবেন কিন্তু যেন শচী স্বর্গে আনীতা না হন ইহা তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। ইন্দুবালার প্রশ্নে স্বামার অসামান্য বীরত্ব ও পরাক্রমের আভাষ রহিয়াছে।

"বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কিরণে তেঁহ ?"

এই কথায়, স্বামীকে পরাজিত করিয়া শচীকে উদ্ধার করিতে হইলে শচীর রক্ষককে 'সমরে নিপুণ' ও 'রণে যশস্বী' হইতে হইবে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে স্বামীও তল্লক্ষণাক্রান্ত ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমীলা এরূপস্থলে কি করিয়াছিলেন? মহাবীর পতি রণে গমন করিলে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হইয়া যাতনাভোগ করিবে অথবা নিহত হইবে এরূপ কোনও চিন্তা কি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল? না। তিনি কেবল স্বার্থপরতার বশবর্ত্তিনী হইয়া পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণার চিন্তায় কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। একজনের চিন্তা পূতা মন্দাকিনীর বারিধারার ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্র; আর একজনের চিন্তা বর্ষানদীর অস্বাস্থ্যকর আবিলজল-প্রবাহ। আরও শুনুন ইন্দুবালা ভাবিতেছেন—

"আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে কেন তিনি তায়
না করিয়া দয়া. হইয়া নিঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি নাহি কাছে ;
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম।
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমারই হৃদয় কাঁপে !
না জানি একাকী গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে ?
ঐন্দ্রিল দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ।
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী দানব মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী ;
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পুরে নাকি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিলা আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশ,
কি আশা মিটিবে শেষ।
যার দিয়ে তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি :
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না ; রতি !"

ইন্দুবালা শচীর ভাবী দুঃখ ভাবিয়া কতই ক্লেশ পাইতেছেন ! বিশ্ব-বিশ্রুত-যশা শ্বশুরের বৈজয়ন্ত বিজয় ও স্বর্গ-রাজ্যোপভোগ তাঁহার মনে ধরিতেছে না। পরপীড়নোদ্ভূত যশ ও সুখ তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন। দেবগণকে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিয়া সকল যন্ত্রণা ও সকল আশঙ্কার নিবৃত্তি হইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে শান্তিলাভ হইবে এইরূপ কামনা করিতেছেন। তিনি শক্রপত্নী শচীর প্রতিনিধিরূপে ঐন্দ্রিলার পদ সেবা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ! কিন্তু কৈ এক দিনের জন্যও হতভাগিনী পতিবিরহিনী সীতাদেবীর জন্য প্রমীলাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনা যায় নাই। দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাঁহার মুখে কখনও প্রসঙ্গক্রমে সীতার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই ! কেবল শচীর জন্যই ইন্দুবালার কোমল হৃদয় বিলোড়িত হয় নাই ; দেবদৈত্যগণের দুঃখেও তাঁহার করুণ হৃদয় কাতর হইয়াছে। তিনি রতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

"পারিনা সহিতে, প্রদ্যুম্ন-কামিনি
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্য-সেনা কত মরে অহর্নিশি
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল, এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্য-সুতা হয় অনাথিনী !
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেবতনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় লীন !"

আর এক স্থানে সখীকে বলিতেছেন ;—

দিনে, হায়, সখি, এ সমরস্রোত
শুকা'য়ে নিঃশেষ হবে ? কতদিনে পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী ?
পুত্র-শোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখিরে, বিদরে হিয়া !—বিদরে লো প্রাণ
স্বামীহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন !
ভগিনীর খেদস্বর ভ্রাতার বিয়োগে !
হায়, সখি, বল তোরা—বল কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি ?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া !
না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া ;
সদাই উন্মাদপ্রায় নিঠুর সমরে,
হানি অস্ত্রে বধে প্রাণী, ভাবেনা অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে—জীবন নিধনে !"

কি সার্ব্বজনীন করুণাপ্রবণতা! শত্রু-মিত্রের প্রতি কি অদ্ভুত অপক্ষপাতিতা! ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের কি সুমহতী গভীরতা! সাধ্বী পরিহাসচ্ছলে কথিত স্বামীর সামান্য নিন্দাবাদও সহ্য করিতে পারেন নাই। রতি যখন বলিলেন—

—"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নিদয় এতই কেন?"

ইন্দুবালা অমনি—

"বলোনা ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জাননা তাঁয়,
দেখনা কি কভু শৈল অঙ্গে কত
স্বাদু নীর ধারা ধায়!"

বলিয়া কথায় বাধাদিলেন। স্বামীর দোষ নিজগুণে ঢাকিবার ও স্বামীর পাপে নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বলিলেন—

"শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণে প্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়॥
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আমি।
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী॥

মন্মথ-রমণী, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস;
পতির এদোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস॥
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর;
বলিয়া; লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার।"

পাঠক! সমপ্রকার অবস্থায় প্রমীলা ও ইন্দুবালার কার্য্যপ্রণালী ও মনোভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; এখন ভাবুন উভয়ের চরিত্রের কি পার্থক্য ও বিশেষত্ব; আর মহাকবিদ্বয়ের সেই দুইটী চরিত্র-চিত্রণে কিপ্রকার বিভিন্ন পন্থাবলম্বন!

তারপর আমরা প্রমীলার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ পাই তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে। ইন্দ্রজিৎ সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু দীর্ঘকাল ফিরিয়া আসিলেননা। তাঁহার কি কোনও বিপদ ঘটিল, এইরূপ চিন্তায় প্রমীলা

"—পতি বিরহে কাতরা যুবতী
অশ্রু আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু; ব্রজকুঞ্জবনে হায়রে, যেমতি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে; অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিনী, শূন্যনীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে,
একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কাপানে,
অবিরল চক্ষুজল মুছিয়া আঁচলে!"

স্বামীর অনাগমনের কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেননা; ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল: সমসুখদুঃখভাগিনী প্রিয়সখী বাসন্তীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"ওই দেখ আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে;
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুলপতি:
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তিকালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ,আমি বুঝিতে না পারি,
তুমি যদি পার সই, কহলো আমারে।"

বাসন্তী তাঁহাকে নানামতে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মেঘনাদের অজেয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়া মানবের অস্ত্রে তদীয় কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি আসিলনা। স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কা ক্রমশঃ প্রবল হওয়ায় তিনি বাসন্তীর নিকট লঙ্কায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বাসন্তী কহিল

"—কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"

শুনিয়া বীরজায়ার হৃদয় অভিমানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন;

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি!
দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

এরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর উপযুক্তই হইয়াছে। ইহা আমরা অনেক বীরপুরুষেরও হৃদয়ে দেখিতে পাই নাই। পতিপ্রাণা বীর্য্যবতী পতির অকুশলাশঙ্কায় ব্যথিতহৃদয়া রমণীর ভীমকাণ্ড আলেখ্য জগৎ বিমুগ্ধ করিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরের অতুলপ্রতিভা ও অসামান্য চিত্র কৌশল তাঁহাকে কাব্যজগতে অমর করিয়াছে!

এই এক চিত্র দেখিলেন; এখন আর এক চিত্র দেখুন—রুদ্রপীড় শচীকে আনিবার জন্য নৈমিষারণ্যে গমন করিবার পর ইন্দুবালা সে সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার অভিলাষে বলিতেছেন—

"আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী'পর
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কভুত নহে অন্যথা॥
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী॥
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে আপনি,
রমণীর প্রতি বল!
চল, রতি, চল লইয়া আমারে
যাব সে অবনীতল।"

রতি বলিলেন—

"দৈত্যকুলবধূ,
তাও কি কখন (ও) হয় ?
ভ্রমে চারিদিকে　　সদা দেবসেনা,
পুরীতে দানবচয় !"

শুনিয়া ইন্দুবালা প্রমীলার ন্যায় শত্রুসেনা বিমর্দ্দিত করিয়া গমনপথ পরিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প করিলেন না অথবা রতি তাঁহাকে ভীরু মনে করিয়া দেব-দানব-সেনা-পরিবৃত পথের উল্লেখ করায় ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর ন্যায় সখীকে তিরস্কার করিলেন না। তিনি বলিলেন—

"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?
*　*　*　*
যাইতে অবশ্য　　আছে কোন (ও) পথ,
সেই পথে চল রতি ॥"

এবং রতির প্রত্যুত্তরে—

"বীরপতি তব,　　যাবে ব্যূহ ভেদি
তুমিত যুদ্ধ জাননা ॥"

শুনিয়া দূরে রণ-শব্দ শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন ! প্রমীলা ও ইন্দুবালা উভয়েই বীরপত্নী। মেঘনাদ ও রুদ্রপীড় উভয়েই সুবিখ্যাত বীর। প্রমীলার হৃদয়ে নারীজনোচিত কোমলতা ও বীররমণীর তেজস্বিতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন এবং ইন্দুবালার হৃদয়ে কোমলতা ও পরদুঃখকাতরতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। একজন যুদ্ধের নামে উত্তেজিত হইয়া উঠেন ; আর একজন যুদ্ধের দূরাগত শব্দ-শ্রবণে অধীর হইয়া পড়েন। রুদ্রপীড় মহাবীর হইলেও তাঁহার হৃদয়ে শত্রুর প্রতি দয়া মমতা আছে। আমরা ইন্দুবালার

"দেখনাকি কভু,　　শৈল অঙ্গে কত,
স্বাদু নীরধারা ধায়।"

এই উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করিবার অবসরও পাইয়াছি। জয়ন্ত নৈমিষারণ্যে যুদ্ধে পরাজিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে শচী যখন তাঁহাকে কোলে করিয়া শোকাকুল হৃদয়ে 'অর্দ্ধ অচেতন' অবস্থায় বসিয়াছিলেন, সে সময়ে

"ভাবে দৈত্যসুত মনে,　চাহিয়া শচী বদনে　বুঝিবা নিষ্ফলে যায়,　জনকের অভিপ্রায়,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;　　সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস ?
ধরিতে না উঠে কর,　চরণ হয় অচর,　জয়ন্ত সমরে হত,　সুধু সে সুখ্যাতি কত ?
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?　　বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত অভিলাষ ॥"

তিনি করুণাপরবশ হইয়া স্বর্গপুরে শচী-আনয়ন সঙ্কল্প [illegible]

পরাঙ্মুখপ্রায় ও জয়ন্ত-বিজয়রূপ নিজের অতুল যশোরাশি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আবার পুত্র মুখে শচীর রূপব্যাখ্যা শ্রবণে ঈর্ষান্বিতা বৃত্র-মহিষী শচীকে কিঙ্করীরূপে সঙ্গে লইয়া সুমেরুশিখরে মহোৎসবে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে

"শুনিয়া জননী বাক্য, বিনয় বচনে
রুদ্রপীড় কহে, মাতঃ, খেদ কি কারণে
দাসী হইতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী,
মহত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি?"

এরূপ মহান্ হৃদয় ইন্দুবালার স্বামীর উপযুক্ত। এই সঙ্গে ইন্দুবালার পূর্ব্ব-কথিত বচনাবলী স্মরণ করা যাউক। ভুবনবিজয়ী মহামহিমান্বিত শ্বশুর বিজিত বৈজয়ন্ত ধামের অধীশ্বর; স্বামী মহাপরাক্রমশালী দেবসমরে প্রখ্যাত-কীর্ত্তি পত্নীবৎসল যুবরাজ। নবীন বয়স; অসামান্য রূপলাবণ্য। কিন্তু কিছুতেই ইন্দুবালার কোমল হৃদয়ে শান্তি নাই। কাল সমর তাঁহার করুণ হৃদয়ে নিরতিশয় যাতনা উৎপাদন করিতেছে। এহেন সৌভাগ্যমণ্ডিত দেহ-পণে শান্তি ক্রয় করিতে, জীববিনাশ নিবারণ করিতে তিনি অভিলাষবতী হইয়াছেন! পাঠক! পতি ও পত্নীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল দর্শন করিলেন; এখন বলুন তাঁহারা পরস্পরের উপযুক্ত কিনা? কিন্তু আমরা মহাবীর মেঘনাদের হৃদয়ে এরূপ করুণাপ্রবণতা ও শত্রুর প্রতি সহানুভূতি কখনও দেখি নাই। সুতরাং প্রমীলা মেঘনাদের অনুরূপ সহধর্ম্মিণী ও ইন্দুবালা রুদ্রপীড়ের উপযুক্ত পত্নীরূপেই চিত্রিতা হইয়াছেন। উভয়েই মহাকবিদ্বয়ের অনুপম ও সুসঙ্গত সৃষ্টি। সমরে বিদ্বেষের অভাব রুদ্রপীড় পত্নীর পক্ষে ও উৎসাহের অভাব ইন্দ্রজিৎ প্রণয়িণীর পক্ষে নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত হইত।

প্রমীলা বীরদর্পে লঙ্কাপ্রবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমর-সজ্জায় যথারীতি সুসজ্জিত হইয়া

"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;—লঙ্কাপুরে: শুনলো দানবি?
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে!
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা.
প্রাণনাথ, কিছু আমি নাপারি বুঝিতে
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব সাগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠ:—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা মম;
নতুবা মরিব রণে - যা থাকে কপালে!"

প্রমীলা সখীগণ সমভিব্যাহারে রণ-রঙ্গে লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইলেন। পবননন্দন হনুমান সে দ্বারের রক্ষক ছিলেন—তিনি প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনীকে সঙ্গে লইয়া তদীয় আগমনের কারণ শুনাইবার জন্য রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র দূতীমুখে প্রমীলার আগমনের উদ্দেশ্য

অবগত হইয়া সৌজন্য সহকারে নির্ব্বিবাদে পথ ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং কৌতূহলবশে বীরাঙ্গনাকে দেখিবার ইচ্ছায় বাহির হইয়া দেখিলেন,

"তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশীকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা খেলিছে চৌদিকে
রতন সম্ভবা বিভা ক্ষণপ্রভা সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতি পতি,
ধরিয়া কুসুম ধনু মুহুর্ম্মুহু হাসি
অব্যর্থ কুসুমশরে। সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা, ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে"

দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন; মায়াদেবী বলিয়া তাঁহার মনে ভ্রম জন্মিতে লাগিল, কিন্তু বিভীষণের বাক্যে নিঃসংশয় হইয়া সভয়ে দ্বাররক্ষার বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমীলা লঙ্কা প্রবেশ করিলেন; পতি পত্নীর মিলন হইল। ইন্দ্রজিৎ সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন; নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া ইষ্টদেব বৈশ্বানরের বরলাভপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবেশ করিবেন। তৎপূর্ব্বে জননীর আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য সস্ত্রীক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মন্দোদরী সাশ্রুনয়নে পুত্রকে বিদায় দিয়া পুত্রবধূকে নিকটে রাখিলেন। প্রমীলার স্বামী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু

"কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;—
'থাক মা, আমার সঙ্গে, তুমি, জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী॥"

প্রমীলা শ্বশ্রূদেবীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। মেঘনাদ একা যজ্ঞাগারের পথে প্রস্থান করিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিবার পর প্রমীলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বশে পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উদ্দেশ্য পতিকে রণে নিরস্ত করিবার চেষ্টায় নহে; তাঁহাকে বীরসাজে সাজাইয়া দিবার অন্তরের অভিলাষ বিজ্ঞাপন। তিনি বলিলেন—

"ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব, তব সাথে,
সাজাইব বীরসাজে তোমায়! কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি শশিকলা নাকি
রবিতেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি;
হে রাক্ষসকুলরবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে।"

প্রমীলার অভিলাষ পূর্ণ হইলনা— গুরুজনের আজ্ঞা অন্তরায় হইল। মেঘনাদ একা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। সাধ্বীর হৃদয় পতির ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছিল, কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য ও বীর রমণীর উপ-

যুক্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানসহকারে স্বকীয় মানসোদ্বেগ সংযত করিয়া পতির রণযাত্রায় বাধা দেন নাই। স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া সতী

"আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি !
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
দেখো মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে।"

অপর পক্ষে ইন্দুবালার দিকে দৃষ্টিপাত করুন—রুদ্রপীড় দেব-সমরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জনকজননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইন্দুবালার নিকট উপস্থিত হইলেন।

"দূর হৈতে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিয়া উতলা হয়ে ইন্দুবালা বালা,
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া ;
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।
কহিলা—কোকিলা ধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায় যবে ভগ্নস্বরে, ডাকে পিকবধূ)
কহিলা " হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ ?
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু ?
কি নিঠুর, হায়, তুমি !—ললনা হৃদয়
মথিতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া ?
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র ; দেখাইও না আর
বিভীষিকা ; তরুণীর হৃদয় মথিতে।
ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ ?
খোল, প্রভু, রণসাজ—না পারি সহিতে !"

রুদ্রপীড় কহিলেন—

'প্রেয়সি, নিঠুর, আমি সত্যই কহিলা ;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে প্রিয়ে, লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।"

রণ-গমনের সংবাদ শুনিয়া ইন্দুবালা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; রুদ্রপীড়

"—স্নেহে চুম্বি অধর ললাট
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।"

রুদ্রপীড় প্রস্থান করিলেন—দুর্দ্দম যশোলিপ্সা সাধ্বী কোমলাহৃদয়া তরুণীর কাতরক্রন্দনে সংযত হইলনা। ইন্দুবালা স্বামীর মঙ্গলকামনায় শিবপূজার আয়োজন করিলেন ; ধ্যানান্তে সবিম্ব জল শঙ্করমূর্ত্তির মস্তকে ঢালিবার সময়ে

"সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন মঙ্গল ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেব মূর্ত্তি পরে—খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ;
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে !"

এই অমঙ্গলসূচক দুর্ঘটনায় সাধ্বীর কোমল হৃদয় একেবারে ভাজিয়া পড়িল—তিনি পতির পুনরাগমন আশায় নিতান্ত নিরাশ হইয়া উঠিলেন। রতি নানামতে বুঝাইয়া অবশেষে শচীর কারাক্লেশের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন। পাঠক দেখিলেন একজন যুদ্ধযাত্রায় পতিকে

সাজাইয়া দিবার জন্ত কতই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই মনোরথ পূর্ণ হইলনা দেখিয়া কতই দুঃখিত হইতেছেন। এদিকে আর একজন পতিকে যুদ্ধ সাজ খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং সেই অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন! উভয়েই দেবানুগ্রহে বিশ্বাসবতী; কিন্তু একজন প্রার্থনামাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, আর একজন মানসিক কার্য্য প্রচুর বলিয়া গণ্য নাকরিয়া পূজা অর্চ্চনাদি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইপ্রকার চিত্রই সুসঙ্গত, মনোহর, আন্তরিক ভাব প্রকাশক ও কবির অতুল প্রতিভার পরিচায়ক।

শেষদশা উভয়েরই প্রায় একপ্রকার। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যজ্ঞাগারেই লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইলেন। প্রমীলা পতির বিদায়কালে তাঁহার উপর করালকালের যে নির্ম্মম কুঠার আপতিত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, দৈববশে তাহাই হইল! প্রমীলা সহমৃতা হইবেন। পাঠক একবার তাঁহার অন্তিম চিত্র দর্শন করুন—

"সুবর্ণ শিবিকাসনে আবৃত কুসুমে
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী
মর্ত্ত্যে রতি মৃতকামসহ সহগামী!
ললাটে সিন্দুরবিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ভুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর, কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ; আকুল বিষাদে
রক্ষঃকুল নারীকুল কাঁদে হাহারবে;
... ... মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যথা যক্ষপতি বিরাজেন এবে"

পরে—

"অবগাহিদেহ
সাধ্বীসতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাবে দৈত্যবালাদলে
কহিলা—'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি, মায়েরে মোর,—'
মুহূর্ত্তে সংবরি শোক, কহিলা সুন্দরী;
'কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা তাইলো ঘটিলা
এতদিনে। যার হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনুলো আজ তাঁর সাথে;
পতিবিনে অবলার কি আছে জগতে?
আর কি কহিব সখি! ভুলোনা লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি পদতলে
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে!"
... ...

তার পর শিবের আদেশে

"ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে;
সহসা জ্বলিলা চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি। বামভাগে প্রমীলা রূপসী
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখ হাসিরাশি মধুর অধরে।"

সকল ফুরাইল! সমস্ত যাতনার অবসান হইল! কুলবধূর আদর্শস্থানীয়া, পতিপরায়ণার শীর্ষবিহারিণী, বীর্যাবতী রমণীর অগ্রগণ্যা মেঘনাদের প্রিয়তমা পত্নী এইরূপে পতিপ্রেম, তেজস্বিতা, গুরুজন বশবর্ত্তিতা ও স্বামীর প্রতি অন্তিম কর্ত্তব্যপরায়ণতায় বিশ্ববাসিগণকে বিমোহিত ও চমকিত করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন ও শিবধামে স্বামীসহ অনন্তকাল সুবিমল নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য-প্রেম উপভোগ করিতে লাগিলেন।

রুদ্রপীড় সমরে প্রবেশ করিয়াছেন ও অদ্ভুত পরাক্রমে দেবরথিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। শচী তাঁহার বীর্য্যবত্তায় চমকিত হইয়া ইন্দুবালাকে বলিলেন -

"একি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।
আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম আমি জগতের মণি
কি বীর্য্য সাহস, কি শিক্ষাকৌশল
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শক্র বটে, ধন্য বীরবাখানি!"

ইন্দুবালা কিন্তু সে বীরত্বের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না - তিনি কেবল স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীদেবীর বীরত্বব্যাখ্যা শুনিয়া কহিলেন—

"সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া হায়, অভয় দেহ—
না দেবে ঘটিতে কোন (ও) অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর!
আমারই অদৃষ্টদোষে হেন বীর
নাজানি কপালে কি আছে শেষ?"

ইন্দুবালা বীরত্ব চাহেন না, শৌর্য্য চাহেন না; চাহেন কেবল পতিকে। রুদ্রপীড় মহাবীর হইয়াছেন সে কেবল আপন দুর্ভাগ্যের দোষ বলিয়া মনে করিতেছেন। বীর না হইলে স্বামী যুদ্ধে যাইতেন না, তাঁহার মরণের সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিত না, অনুক্ষণ স্বামীসহবাসে তরুদেহাশ্রিতা লতার ন্যায় থাকিতে পাইতেন এই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ।

কিন্তু কালচক্রের অপরিবর্ত্তনীয় আবর্ত্তনে, অদৃষ্ট-দেবের দুরতিক্রম্যবিধানে